সাহিত্য সম্রাট
বঙ্কিমচন্দ্র

সুনি বাগচি

ছোটদের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগের নতুন ঠিকানা
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

বাঙালির সাহিত্য ও ভাষা প্রথম তৈরি করলেন বিদ্যাসাগর, তারপর তাঁর অলৌকিক প্রতিভার স্পর্শে সেই সাহিত্য ও ভাষা দিব্য সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠলো তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব শুধু এইটুকু নয়। বাঙালির সকল রকম উন্নতির কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আর কেউ চিন্তা করেন নি। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো পরিচয় তাঁর আছে। তিনি ছিলেন জাতীয়তার উদ্বোধক। তাঁর লেখা পাঁচ অক্ষরের একটি মন্ত্র আসমুদ্রহিমাচল ভারতের কোটি কোটি মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেই মন্ত্রটির নাম — 'বন্দেমাতরম্'।

সেই লেখকের প্রতিভা, সেই বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথা এই বইতে সংক্ষেপে আলোচিত হলো।

২০ [illegible] রোড
কলিকাতা ২৮

জ্ঞান মণ্ডল

বঙ্কিমচন্দ্র

. . .   .

হে বঙ্গের জল স্থল! হে চির সুন্দর! সুশোভন!
মধুর তোমার সবে [১]; মধুময় দাক্ষিণ পবন—
বঙ্গের নিকুঞ্জবনে, পিক কণ্ঠে আছে মধু, জানি,
তাহতে অধিক মধু মন্ত্রমত্ত বঙ্কিমের বাণী।
বঙ্কিমের হিয়া সে যে সুবিশাল বঙ্গেরই হৃদয়,
দেখেছে সে দেবীমূর্তি স্বদেশের অরূপ অক্ষয়।
বঙ্গের বঙ্কিমচন্দ্র। নৃমণি সে ছিল নরকুলে,
যতনে তার তীর্থধার সাজাইয়া দিয়াছিল খুলে
সৌন্দর্য দেবতা নিজে। জন্ম লভি' শুষ্ক দুর্বৎসরে
নিরানন্দ ফিরেছে সে সৌম্যমূর্তি; মরুভূমি 'পরে—
হৃদি-পদ্ম জিনি' রাঙা ফুটায়েছে অজস্র গোলাপ
গদ্যে অনবদ্য করি' যেভাবে সে করেছে আলাপ।

—শ্রীঅরবিন্দ

S.P. | ১ মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

এক

বন্দে মাতরম্ ।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্

শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ।

এই প্রাণ-মাতানো গান কে লিখেছেন, জানো?

লোকোত্তর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র।

জাতীয়তার উদ্গাতা, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এই নাম বাঙালি কে না শুনেছে? বঙ্কিমচন্দ্রকে না জানলে বাংলা সাহিত্য জানা যায়না। তাঁর বই না পড়লে বাংলা বিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়না। তাঁর জীবনকথা সত্যিই জীবনপ্রদ — অমৃত সমান। তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। বাঙালির মুখে বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন ভাষা, দেশের প্রাণে জাগিয়েছেন আশা আর হৃদয়ে জ্বেলেছেন আলো। ভগীরথের মতোই একদিন শঙ্খ বাজিয়ে বাংলার শ্যামল মাটিতে তিনি এনেছিলেন নবীন প্রাণের প্রবাহ। সেই পূত প্রবাহধারায় স্নান করে, সেই অমৃতবারি পান করে বাঙালির কায় হলো পবিত্র, মন হলো স্নিগ্ধ। বাঙালি পেলো এক নতুন জীবনের স্বাদ। নতুন জীবনবোধ।

আর ওই মনীষীর জীবনকথা তোমাদের বলব।

তাঁর জীবনকথা পাঠ করলে তোমরা বুঝতে পারবে, বাঙালির কত বড়ো [illegible] ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বুঝতে পারবে তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আর চরিত্রের মহত্ত্ব। তাঁর বই পড়ে তোমরা জানতে পারবে সেকালের বাঙালির, ধনি-কাঙালের ঘর-সংসারের কথা, সুখ-বেদনা আর আশা-আকাঙ্ক্ষার তথা সমাজের কথা।

#space#

কাঁটালপাড়ার চাটুয্যে বাড়ি।

কলকাতা থেকে কিছু দূরে গঙ্গার তীরে নৈহাটি গ্রাম। 'পরিপাটি নৈহাটি গ্রাম।' সেকালে এই নৈহাটির খুব নাম-ডাক ছিল। বড়ো বড়ো পণ্ডিতরা এখানে বাস করতেন; সারা বাংলায় ছিল তাঁদের খ্যাতি। কাছেই ভাটপাড়া যার অন্য নাম ভট্টপল্লী। সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র। ভাটপাড়া বাংলার গৌরব। এখান থেকেই সমাজ-শাসনের বিধান দিতেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা। এই নৈহাটি রেল-স্টেশনের কাছেই কাঁটালপাড়া। রেললাইন পার হলেই চাটুয্যেদের বাড়ি।

তিনমহলা বাড়ি। বাড়ির পূর্বদিকে ফুলের বাগান; বাগানে সবরকম ফুলের গাছ। তার পাশেই শান-বাঁধানো ঘাট-সহ বড়ো পুকুর – ভীমা দীঘি। এই দীঘি স্মরণীয় হয়ে আছে 'ভীমা পুষ্করিণী' নামে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে। দীঘির স্বচ্ছ-শুভ্র জল টল টল করছে বারো মাস। নৈহাটি অঞ্চলে এমন জমকালো বাড়ি আর একটিও ছিল না। বাইরের মহলে বৈঠকখানা, পূজার দালান, ভেতর মহলে রান্নাঘর আর দাস-দাসীদের থাকবার জায়গা। তারো ভেতর অন্দর মহল – মেয়েরা যেখানে থাকতেন গৃহকর্ত্রীর কঠোর শাসনের মধ্যে।

সব কিছু মিলিয়ে যেন লক্ষ্মী-শ্রীর ছাপ বাড়িটির সর্বাঙ্গে। বাড়ীটি যেমন জমকালো, বাড়ির কর্তাদেরও ছিল তেমন প্রতিপত্তি। প্রতিপত্তির সঙ্গে ছিল বিদ্যা আর বিত্ত। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এই বাড়ির কর্তা ছিলেন রায়বাহাদুর যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, দীর্ঘকায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন, মহিমা-মণ্ডিত তেজস্বী পুরুষ। তাঁকে দেখলেই মনের মধ্যে শ্রদ্ধার ভাব জাগে, ভক্তি করতে ইচ্ছা হয়। ইনিই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বনামধন্য পিতা।

যাদবচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার দেশমুখো গ্রামে। তাঁর জন্মের দুই পুরুষ আগে নৈহাটির উপকণ্ঠে কাঁঠালপাড়ায় প্রথম বসতি স্থাপন করেন রামহরি চট্টোপাধ্যায়। ইনি যাদবচন্দ্রের ছিলেন ঠাকুরদা। রামহরি ছিলেন এখানকার ঘোষাল বাড়ির ঘর-জামাই। তখন অনেক পরিবারে ঘর-জামাই রাখার প্রথা ছিল। এই ঘর-জামাইদের নিয়ে একখানা সুন্দর নাটক আছে বাংলা ভাষায়; নাম – 'জামাই-বারিক'। এটি লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু দীনবন্ধু মিত্র। তোমরা বড়ো হয়ে এই নাটকটি নিশ্চয়ই পড়বে।

চাটুয্যে বাড়ির কথার সঙ্গে রাধাবল্লভের কথাও বলতে হয়। ইনি এই পরিবারের গৃহ-দেবতা। কাঁঠালপাড়ায় আজো তাঁর মন্দির আছে। মন্দিরটা চাটুয্যে বাড়ির সীমানার মধ্যেই। সেকালে বাঙালি হিন্দুর বাড়িতে সকলের আগে কুলদেবতার পূজা ও সেবার ব্যবস্থা ছিল। চাটুয্যে পরিবারেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তাঁদের কুলদেবতা এই রাধাবল্লভকে কুলের কল্যাণকেন্দ্র বলে বিশ্বাস করতেন। বলতেন: 'ইনি আমাদের বংশের সর্বপ্রকার মঙ্গলবিধান করেন, সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন। রোগে শোকে, বিপদে আমরা উঁহারই মুখ চাহিয়া থাকি; উঁহাকেই ধরি। উনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন।' ঈশ্বর ও দেবতায় এই রকম বিশ্বাস ছিল বলেই না বঙ্কিমচন্দ্র অত বড়ো হতে পেরেছিলেন।

এই রাধাবল্লভ বিগ্রহটি যে কতদিনের তা কেউ বলতে পারে না। কত সাধু ও ভক্তের হাত ঘুরে অবশেষেই ইনি কাঁঠালপাড়ার ঘোষাল পরিবারে এসে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সে ইতিহাস কেউ জানে না। রামহরি যখন তাঁর শ্বশুরের

সম্পত্তি লাভ করেন, তখন রাধাবল্লভ তাঁর হাতে পড়েছিলেন। সেই থেকে ইনি চাটুয্যে বাড়ির গৃহদেবতা হিসাবে অবস্থান করতে থাকেন। এই পরিবারের সৌভাগ্যের সূচনা তখন থেকেই। তারপর মদনচন্দ্রের আমলে রাধাবল্লভের একটা এ রকম মন্দির নতুন করে তৈরি হয় ও বিগ্রহের নিয়মিত সেবাপূজার জন্য কিছু দেবোত্তর সম্পত্তির বন্দোবস্ত তিনি করে দিয়েছিলেন। তাঁর সময় থেকেই কাঁটালপাড়ার প্রধান দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছিল এই রাধাবল্লভের মন্দির। শুধু দ্রষ্টব্য নয়, আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছিল তা। বারোমাসে তেরো পার্বণ হোত রাধাবল্লভের। রথে খুব জাঁক হোত। রথের সময় একটা মেলা বসত আর একপক্ষ কাল ধরে চলত কত যাত্রা, নাচ, গান আর কীর্তন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ছেলেবেলায় এই রথের মেলা দেখেছেন আর শুনেছেন কত কীর্তন আর যাত্রা। তাঁর একটি উপন্যাসে এই রথের মেলার ভারী সুন্দর বর্ণনা আছে।

প্রতি বছর পূজোর সময় তিন দিন ধরে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হোত। কাঁটালপাড়ার লোক যেন ভেঙে পড়ত সেই যাত্রার আসরে। সেখানে শ্রোতাদের মধ্যে বালক বঙ্কিমকেও দেখা যেত। বড়ো হয়েও তিনি এই যাত্রার কথা ভুলতে পারেননি। বলতেন, অধিকারীর যাত্রায় কৃষ্ণলীলা শুনে আমার মনে তখন কী যে আনন্দ হোত তা বলে বোঝান যায় না। এই ধরনের যাত্রা আর কথকতাই তো বাংলার লোক-সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছিল সেদিন। এর দ্বারা যেমন জনসাধারণের চিত্ত-বিনোদন করা হোত, তেমনি লোকশিক্ষার ধারাটিও বজায় থাকত।

কৃষ্ণকথা তাঁর মনে ছেলেবেলায় এমন দাগ কেটেছিল যে শেষ বয়সে তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' নামে একটি সুন্দর বই আমাদের উপহার দিয়েছিলেন।

যাদবচন্দ্রের জীবন বড়ো বৈচিত্র্যপূর্ণ।

তাঁর বয়স যখন পনের-ষোল বছর তখন একবার তাঁর কঠিন অসুখ হয়। জীবনসংশয় পীড়া। বাঁচবার আশা পর্যন্ত ছিল না। প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে শ্মশানে আনা হয়েছিল। সেইখানে হঠাৎ এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হলো ও তাঁর কৃপায় যাদবচন্দ্র রোগমুক্ত হন। তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কথিত আছে, এই সন্ন্যাসীই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যাদবচন্দ্রের তৃতীয় সন্তানরূপে যে ছেলের জন্ম হবে, সেই ছেলে হবে ক্ষণজন্মা। শুধু চাটুয্যে বংশের নয়, সমস্ত দেশের গৌরব বৃদ্ধি পাবে সেই ছেলের দৌলতে।

সন্ন্যাসীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন চাটুয্যে বংশের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন, তেমনি বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। আজিও তিনি বাঙালির সর্বকালের গর্বের নিধি, গৌরবের পাত্র। তাঁর বিরাট প্রতিভার দানে বাংলা সাহিত্য যে কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে তা বলা যায় না।

যাদবচন্দ্র ফার্সি ও ইংরেজিতে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তখনো নবাবী আমলের এই ভাষার চল ছিল। উড়িষ্যার কটকে নিমক মহলে তিনি চাকরি গ্রহণ করেন। খুব সৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি, চরিত্র ছিল খুব দৃঢ়। সততার সঙ্গে মিলেছিল দক্ষতা। সেই অল্পকাল মধ্যেই চাকরিতে যাদবচন্দ্র খুব সুনাম অর্জন করেন। তাঁর উপরওয়ালা সাহেব অফিসারেরা সকলেই তাঁর কাজের সুখ্যাতি করতেন। এই সুনাম আর সুখ্যাতির ফলেই উত্তরকালে তিনি ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যে

বছরে তাঁর তৃতীয় পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়, সেই মুহূর্তেই চাকরিতে যাদবচন্দ্রের পদোন্নতি হয়েছিল। পিতার সৌভাগ্যের সূচনা করেই পুত্রের জন্ম হয়েছে, যাদবচন্দ্র এটা বিশ্বাস করতেন।

চাটুজ্যে পরিবারের যা কিছু প্রতাপ-প্রতিপত্তি, যে প্রকৃতপক্ষে যাদবচন্দ্রের সময় থেকেই। তখন থেকেই এঁদের বলা হোত 'রয়্যাল ফ্যামিলি'। একই পরিবারে পিতা ও তাঁর সবকটি পুত্রই হাকিম হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত তখন খুব বেশি ছিল না। উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন কলকাতায় [struck out] বাস করতেন তখন তাঁর অন্তরঙ্গ-সুহৃদদের কাছে বলতেন অনেক সময় পরিহাস করে: 'জানো, আমরা যেমন-তেমন পরিবারের ছেলে নই — একেবারে রয়্যাল ফ্যামিলির ছেলে। বাবা ডেপুটি ছিলেন, আমরা চারটি ভাইও তাই।'

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন শহর কলকাতা[১] ও বাংলায় ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হয়েছে। সবেমাত্র ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হয়েছে। সেই কালের কথা আজ আমরা শুধু কল্পনা করতে পারি। তখন বাংলা ছিল পল্লীকেন্দ্রিক। তবে বাণিজ্যকেন্দ্র আর ইংরেজি শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে কলকাতা তখন ধীরে ধীরে একটা নগর হয়ে গড়ে উঠেছিল। নাগরিক সভ্যতার পীঠস্থান বলতে তখন জব চার্নকের কলকাতাকেই বোঝাত। কালান্তরে যা ঘটে থাকে বাংলায় তাই ঘটে চলেছিল মহাকালের অমোঘ নিয়মে। পুরানো দিনের বদলে নতুন কালের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। সমাজ-জীবনে ধীরে ধীরে দেখা

১ ১৬৯০ সালে জব চার্নক সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা — এই তিনটি গ্রাম ইজারা নিয়ে শহর কলকাতার পত্তন করেন। ইংরেজ আমলের প্রথম শহর।

দিচ্ছিল নতুন এক তরঙ্গ। সেই তরঙ্গ প্রথম উঠেছিল কোম্পানির আমলের শহর কলকাতায়। সেখান থেকে তা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে কলকাতার আশেপাশে — হুগলী নদীর দুই তীরে। বঙ্কিমচন্দ্র জন্মেছিলেন সেই পুরানো আর নতুন কালের সন্ধিক্ষণে।

space

১৮৩৮। ২৭ জুন।

আষাঢ় মাস। রাত তখন ন'টা।

আষাঢ়ের রাত হলেও, আকাশ তখন বেশ পরিষ্কার ছিল। প্রকৃতি শান্ত ও সৌম্য। এমন সময় হঠাৎ চাটুয্যে বাড়ির অন্দর মহলে শাঁখ বেজে উঠল। মঙ্গল শঙ্খ। কিছুক্ষণ পরেই কাঁঠালপাড়ার সকলে জানতে পারল যে, যাদবচন্দ্রের স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। এটি তাঁদের তৃতীয় পুত্র। তৃতীয়, এবং [illegible]। যাদবচন্দ্র তখন কর্মস্থলে বিদেশে ছিলেন। তাঁর কাছে যথাসময়ে এই শুভ সংবাদ প্রেরিত হয় দূত [illegible]। সেদিন — ১৮৩৮-এর আষাঢ়ের সেই মেঘমুক্ত রাত্রির প্রথম প্রহরে কাঁঠালপাড়ার চট্টোপাধ্যায় বংশে যে ছেলেটি জন্ম গ্রহণ করেছিল, তখন [illegible] কেউ কি একথা ভাবতে পেরেছিল যে, এই ছেলেই একদিন বাংলা সাহিত্য জগতের সম্রাটরূপে সম্মানিত হবে? ভাবতে পেরেছিল যে, এই ছেলেই একদিন লিখবেন নতুন কালের নতুন উপন্যাস, সৃষ্টি করবেন অপূর্ব সুন্দর গদ্য আর উপহার স্বজাতিকে, বঙ্গজননীকে, দেবেন স্বদেশসেবার এক নতুন চেতন মন্ত্র — বন্দে মাতরম্?

না, তা কেউ কল্পনা করতে পারেনি।

ইতিহাসের সুলগ্নেই জন্ম হয়ে থাকে মহাপুরুষদের।

তেমনি সুলগ্নে একদিন জন্মেছিলেন, রাধানগরে রামমোহন, বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর, কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়িতে মধুসূদন। আর আবার তেমনি এক সুলগ্নে জন্মগ্রহণ করলেন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি যেন ছিলেন তাঁদের বংশের পূর্বপুরুষদের বহু পুণ্যের ফল, তেমনি তিনি ছিলেন বাঙালীর অনেক দিনের সংস্কারবর্জিত-কৃচ্ছ্র সাধনার সম্পদ।

সেই সেদিন — ১৮৩৮ সালের সেই সাতাশে জুন, আষাঢ়ের মেঘযুক্ত রাত্রির সেই প্রথম প্রহরে শুধু কাঁটালপাড়ার চাটুয্যে বাড়ির অন্দরমহলেই শাঁখ বেজে ওঠেনি, সকলের অগোচরে ইতিহাসের অন্তঃপুরে একটি লোকোত্তর প্রতিভার আবির্ভাব ঘোষণা করে বেজে উঠেছিল মাঙ্গলিক। আকাশের তারায় তারায় ফুটে উঠেছিল তাঁর অভ্যুদয়ের প্রদীপ্ত ইঙ্গিত। কাঁটালপাড়ায় নয়, এই বাংলার শ্যামল কোমল মাটিতে, এবং নবজাগৃতির সূতিকাগারে, ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন নতুন বাংলার নতুন মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র। ঋষির বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দুই

যাদবচন্দ্রের চার ছেলে — শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। বঙ্কিম তাঁর পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। চার ছেলেই যেন হীরের টুকরো, চারজনেই উত্তরকালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। চারজনেই যেমন কৃতবিদ্য, তেমনি ছিলেন সাহিত্যরসিক। বাবা হাকিম, ছেলেরা সব হাকিম, তাই তখন কাঁটালপাড়ার লোকেরা চাটুয্যেদের 'রয়্যাল ফ্যামিলি' নামে অভিহিত করত; বলত, চাটুয্যেদের দেমাক যেন ধরে না।

চাটুয্যেরা কিন্তু দেমাকী ঠিক ছিলেন না। তবুও রাশভারি লোকের মানুষ। যাদব তো খুবই রাশভারী ছিলেন; তাঁর ছেলেরা বাপের প্রকৃতি লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু সবাই খুবই মজলিশী ছিলেন। তাঁদের দেমাক থাকুক আর নাই থাকুক, তবে একথাটা ঠিক যে, সেকালে কাঁটালপাড়ার যেটুকু নাম-ডাক ছিল বাইরে সেটা এঁদেরই দৌলতে। এমন সংস্কৃতিবান, ধর্মপরায়ণ ও বিদ্বান পরিবার সেকালে এ অঞ্চলে খুব বেশি ছিল না। ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থাৎ সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল খুব বেশি। দুই ভাইয়ের সাহিত্যিক প্রতিভাই ছিল এই সম্প্রীতির কারণ। তাই ছেলেবেলা থেকেই এই দুজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সম্পর্কটা উঠে গিয়ে গড়ে উঠেছিল একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

তাঁর সেজদাদার বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে লিখেছেন: 'সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার সহোদর। কাঁটালপাড়া সঞ্জীবচন্দ্রের জন্মভূমি। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইঁহার জন্ম। সে সময়ে গ্রাম্য প্রদেশে পাঠশালার গুরুমহাশয়

শিক্ষামন্দিরের দ্বার রক্ষক ছিলেন, তাঁহার সাহায্যে সকলকেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। অতএব সঞ্জীবচন্দ্র যথাকালে এই বেত্রপাণি দৌবারিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন।... সঞ্জীবচন্দ্র চিরকাল সমান উদার, প্রতিভাপরবশ।

এই সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। তিনি নিজেও বঙ্কিমের অনুরোধে 'ভ্রমর' নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনা করেছিলেন। চাকরিজীবনে তিনি যখন বিহারের[১] হাজারীবাগ অঞ্চলে বদলি হয়েছিলেন তখন ওখানকার কথা নিয়ে একখানি সুন্দর ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন। এই ভ্রমণকাহিনীর নাম 'পালামৌ'। বাংলা সাহিত্যে এটি একটি বিখ্যাত বই। তোমরা বড়ো হয়ে নিশ্চয়ই 'পালামৌ' পড়বে। তখন দেখবে, এমন সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক ভ্রমণকাহিনী খুব বেশি নেই। সঞ্জীবচন্দ্র চারখানা উপন্যাসও লিখেছিলেন; সেগুলির মধ্যে 'মাধবীলতা' প্রসিদ্ধ।

যে বছরে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়, সেই বছরেই যাদবচন্দ্র ডেপুটি কালেক্টরের পদে উন্নীত হন, এ কথা আগেই বলেছি। তিনি তখন বিদেশে তাঁর কর্মস্থলে থাকতেন। কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে তখন অভিভাবক হিসাবে থাকতেন তাঁরই মেজকাকা রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি তখন বৃদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি খুব স্নেহ করতেন; শিশুর জন্মের সময় সূতিকাগৃহে তার ললাট দেখে রামনারায়ণ বলেছিলেন — এ যে দেখছি অসামান্য ছেলে। এ আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে, দেশের গৌরব বৃদ্ধি করবে। বৃদ্ধের এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, তিনি তাঁর ছেলেবেলায় এই মেজকাকার মুখেই

১ আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন বাংলাদেশের মানচিত্রে বিহার বলে কোনো পৃথক প্রদেশ ছিল না। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা একটি প্রদেশ ছিল।

গড় মান্দারনের গল্পটা শুনেছিলেন যেটা অবলম্বন করে তিনি লিখেছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'।

দেখতে দেখতে ছেলের বয়স পাঁচ বছর হলো।

ছেলেবেলায় বঙ্কিম খুব বদ রোখা ছিলেন, যা জেদ করতেন তা-ই না করে নিরস্ত হতেন না। বালকের এই একগুঁয়েমি স্বভাবের জন্য বয়স্করা তাঁর আদরের এই নামটির নাম রেখেছিলেন 'বাঁকা'। খুব ধুমধাম করে বাঁকার অন্নপ্রাশন হয়েছিল; তখন তাঁর নাম রাখা হয় 'বঙ্কিমচন্দ্র'। এই চাঁদের ফালি কালক্রমে কলায় কলায় পূর্ণ হয়ে শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের মতো আলো বিলিয়েছিল সারা বাংলায়। চিরকালের মতো আলোকিত করে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বদেশের আকাশলোক। তিনি সত্যিই সার্থকনামা পুরুষ ছিলেন।

ছেলের বয়স পাঁচ বছর হলো। এবার হাতেখড়ি দিতে হয়। ছেলের হাতেখড়ি উপলক্ষে বিদেশ থেকে যাদবচন্দ্র এলেন কাঁঠালপাড়ায়। তারপর এক শুভদিনে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেখড়ি দিলেন ওঁদের বাড়ির কুলপুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য। এখন আর পুরোনো দিনের সেই প্রথা নেই, এখনকার ছেলেমেয়েদের হাতেখড়ি হয় না। কিন্তু সেকালে হাতেখড়ি না হলে কারো ছাত্রজীবনই শুরু হতো না।

মেজকাকা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের কৃপায় এখন পুরুতের পর্ব শেষ হয়েছে — [illegible] করেছে, যাদবচন্দ্র ওই খুব ঘটা করেই বঙ্কিমের হাতেখড়ি উৎসবটা সম্পন্ন করলেন। সেদিন চেলি ও চন্দনে সজ্জিত হয়ে পঞ্চমবর্ষীয় বালক যখন তার কচি হাতে রামখড়ি জড়িয়ে নিয়ে, নাটমন্দিরে ধোয়া মেঝের উপর লেখা 'অ-আ'—

এই ঝরঝরে চুরির উপর স্বচ্ছন্দে দাগ বুলিয়েছিল। সেদিন কেউ কি ভেবেছিল যে, আজ যে বালকের হাতেখড়ি হলো, সেই উত্তরকালে রচনা করবে নতুন যুগের নতুন সাহিত্য? বীণাপাণি কি তাঁর নিজের সকলের অলক্ষ্যে হাত দিয়ে সেদিন স্পর্শ করেছিলেন এই বালকের ললাটদেশ? হয়ত করেছিলেন, নইলে অমন সোনার সাহিত্য কি সৃষ্টি হবে, না, সোনার বাংলার কথা কি অমন মর্মস্পর্শী ভাষায় রূপ পেত?

হাতেখড়ি হলো।

এবার পাঠশালায় যাওয়ার পালা।

সেকালে পাঠশালা ছিল, গুরুমশাই ছিলেন। এখন সে পাঠশালাও নেই, গুরুমশাইরাও নেই। কাঁটালপাড়ায় তখন চাটুয্যে বাড়ির দালানের মধ্যেই একটি পাঠশালা ছিল। ~~[illegible]~~ যাদবচন্দ্রই এর সব খরচ চালাতেন। বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের আর পাঁচটা ছেলে লেখাপড়া শেখে, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। গুরুমশাইয়ের নাম রামপ্রাণ সরকার। বালক বঙ্কিমচন্দ্র একদিন রামপ্রাণ সরকারের পাঠশালায় এসে অন্যান্য পড়ুয়াদের সঙ্গে একাসনে বসলেন। কেননা গুরুমশাই সকল পড়ুয়াকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন, সমানভাবে পড়াতেন, কোন তারতম্য করতেন না।

পাঠশালায় পড়তে এলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বসলেন পড়ুয়াদের মধ্যে।

যেমন ফুটফুটে চেহারা, তেমনি প্রতিভাদীপ্ত প্রশস্ত ললাট। পাঠশালা যেন আলো করে বসলেন বঙ্কিমচন্দ্র। শান্ত, শিষ্ট, সভ্যভব্য এই নতুন পড়ুয়াটির মেধা দেখে গুরুমশাই তো অবাক। জীবনে তিনি অনেক ছেলে পড়িয়েছেন, কিন্তু এমন মেধাবী ছেলে কখনো দেখতে পাননি। অ-আ, ক-খ দিনকেই সবকো [illegible]

অনের দিন, কারো বা দুই মাস, সেই বর্ণমালা কলায় বসিয়ে দুইদিনেই শিখে ফেললেন। তারপর স্বরবর্ণের 'অলস', 'অবশ' এবং ব্যঞ্জনবর্ণের 'খাদ্য' 'খনিজ' - এই সব কথা শিখতে তাঁর দু'দিনের বেশি লাগেনি। নিশ্চয়ই বালকের পূর্বজন্মের স্মৃতি, সবিস্ময়ে ভাবলেন গুরুমশাই। গড় গড় করে বালক সব কথা পড়ে যায়, কোথাও বাধে না। এইভাবে বালক বসিয়ে মাস্টারদের মধ্যে শেষ করেছিলেন 'শিশুবোধক'। তখনও বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' বেরোয়নি।

এই সময়ে একদিন বৃদ্ধ জয়নারায়ন পাঠশালায় এসে গুরুমশাইকে জিজ্ঞাসা করেন, রামপ্রাণ, নাতি কেমন পড়ছে?

- আজ্ঞে আপনার নাতি যে সাক্ষাৎ সরস্বতী।

- সরস্বতী! বলো কি? তিনি তো স্ত্রীলোক — দেবী বীণাপাণি। আর এ যে ~~পুরুষ মানুষ~~।

- আজ্ঞে, বিলক্ষণ। আপনার নাতি পুরুষ-সরস্বতী। যা একবার পড়ে তা আর তাকে দ্বিতীয়বার পড়তে হয় না।

- বটে! লেখে কেমন?

- আজ্ঞে, লেখা যেন মুক্তোর পাঁতি।

- দুষ্টুমি করে?

- আজ্ঞে না। আপনার নাতিটি বড় শান্ত। পড়ায় ওর খুব মন।

জয়নারায়ন হৃষ্টচিত্তে ফিরে চললেন। গুরুমশাই কিন্তু তাঁর এই পড়ুয়াটির এইরকম বুদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হলেন। তাঁর ভয় হলো যে একবারে তাড়াতাড়ি সব শিখে ফেললে, ছেলেকে তিনি আর কতদিনই বা পড়াবেন। তাই

একদিন যখন পাঠশালার আর সব ছাত্র চলে গিয়েছে তখন তিনি প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বালক বঙ্কিমের হাত দুখানি ধরে ফেললেন; বললেন – বাবা বঙ্কিম, তুমি যদি এইভাবে তাড়াতাড়ি পড়ে যাও, তাহলে তোমাকে আমি আর কতদিন পড়াব?

– কেন গুরুমশাই? বাবা তো আপনাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করবে না। আপনার ভয় কিসের?

বঙ্কিমচন্দ্র যখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন তখন তিনি তাঁর শৈশবের এই গুরুমশাই শিক্ষককে খুঁজে বার করলেন; শুধু তাই নয়, তাঁকে দশটাকা করে মাসোহারা দিলেন। বললেন, শৈশবের শিক্ষাগুরুই মানুষের জীবনের প্রকৃত গুরু।

১৮৪৪

যাদবচন্দ্র তখন মেদিনীপুরের কালেক্টর।

কাঁটালপাড়ায় ছেলেদের পড়াশুনা ভালো হবে না মনে করে তিনি দুই তাঁর ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র – দুজনকেই মেদিনীপুরে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। ছ' বছর বয়সে বঙ্কিম এখানকার ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হলেন। টিড সাহেব নামে জনৈক ইংরেজ ছিলেন সেই স্কুলের প্রধানশিক্ষক। সাহেবরাও বাঙালি ছেলেরা যতদিনে ইংরেজি বর্ণমালা (Alphabet) শিখে যাচ্ছে, বঙ্কিম তার চেয়ে অনেকদিনের আগেই ABCD আয়ত্ত করলেন। প্রধান শিক্ষক তো বিস্মিত হন।

একদিন তিনি তাঁর এই প্রিয় ছাত্রটিকে আদর করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। মিসেস টিড অমন ফুটফুটে মিষ্টি চেহারার শান্তশিষ্ট ছেলেটিকে

দেখে মুগ্ধ হলেন। ইংরেজিতেই তিনি অনর্গল ছড়া বললেন; বালক বঙ্কিমও বিশুদ্ধ ইংরেজিতে মেমসাহেবের প্রশ্নের জবাব দিলেন। সাত বছর বয়সের এক বাঙালী ছেলের মুখে এমন সু-উচ্চারিত বিশুদ্ধ ইংরেজি কথা শুনে মেমসাহেব অবাক। তিনি বালককে কাছে বসিয়ে কিছু কেক ও বিস্কুট খাওয়ালেন। প্রথমে বালক কিছুতেই খেতে রাজী হয়নি। পরে টিড-পত্নী যখন আদর করে কেক বললেন, 'Take this, my child', তখন তিনি আর কোন আপত্তি করলেন না।

হেডমাস্টার টিড সাহেব প্রতিদিন সকালে বেড়াতে বেড়াতে কালেক্টরের বাংলোতে এসেছেন। এই সাহেবটিকে যাদবচন্দ্রের খুব ভালো লাগত। যেমন বিদ্বান, তেমনি অমায়িক। ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করতেই প্রবীণ শিক্ষক বলেন, আপনার ছেলে দুটি ভালো। তবে বঙ্কিম খুব মেধাবী। ওকে ইংরেজি পড়ালে ওর ভালই হবে। He will shine.

টিড সাহেবের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল।

এক বছর পরে যখন ক্লাস-প্রমোশন হয়, তখন দেখা গেল যে, বঙ্কিমচন্দ্র সকল ছাত্রের মধ্যে বেশি নম্বর (marks) পেয়েছেন। হেডমাস্টার ডবল প্রমোশন দিতে চাইলেন। কিন্তু যাদবচন্দ্র আপত্তি করলেন। বললেন, দরকার নেই, এক ক্লাস ওপরেই ঠিক, দুই ক্লাসে দরকার নেই।

মেদিনীপুরেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। এখানে তাঁর নম্র আচরণ, শান্ত স্বভাব ও পড়ায় মনোযোগিতা — এই সব গুণের জন্য তিনি শিক্ষকদের খুব প্রিয় হয়েছিলেন। তারপর এখানকার স্কুলে তিন-চার বছর পারে পড়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র আবার কাঁটালপাড়ায় ফিরে এলেন।

Space

সন ১৮৪৯, অক্টোবর মাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন প্রায় বারো বছর।

এবার তাঁকে হুগলী কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হলো। আমরা সে সময়ের কথা বলছি তখন কলকাতায় হিন্দু কলেজ আর হুগলীতে হুগলী কলেজ — এই দুটি ছিল সরকারী শিক্ষায়তন। দেশের যত বিখ্যাত লোক, তখন যাঁরা, তাঁদের কেউ-না-কেউ হয় হিন্দু কলেজ, না হয় হুগলী কলেজের ছাত্র ছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'নীলদর্পণ' নাটক-রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। তেমনি বাংলা সাহিত্যে যাঁকে বলা হয় 'সাহিত্য-সম্রাট' সেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হুগলী কলেজের ছাত্র।

মেদিনীপুর থেকে কাঁটালপাড়ায় এসে তিনি কিছুকাল বাড়িতেই পড়াশুনা করতে থাকেন। এই সময় তিনি, সংস্কৃত শ্লোক আর বাংলা কবিতা শিখে-ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর ছিল। একবার যা পড়তেন, তা মুখস্থ হয়ে যেত। 'হুগলী কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে ভট্টপল্লীর এক বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে তিনি সংস্কৃত ও বাংলা শিখেছিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে আজকালের মতো এত খবরের কাগজ ছিল না। কাগজ বলতে ছিল 'সংবাদ প্রভাকর'। ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন এর সম্পাদক; তিনিই মালিক। সেকালের দিনে তিনিই ছিলেন বাংলার পুরাতন যুগের শেষ কবি আর নবীন যুগের প্রথম কবি। কবি বলতে তখন একমাত্র তিনিই। তাঁর কাগজে এই সংবাদ ও সাহিত্য দুইই থাকত। 'সংবাদ প্রভাকর' সেকালের খুব

বিখ্যাত আসর ছিল। চাটুয্যে বাড়িতে নিয়মিত ভাবে এই কাগজ আসত। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই পত্রিকাখানি তখন সকলেরই আগ্রহের মধ্যে পড়তো। এই পত্রিকায় যেসব কবিতা বেরুত, কিশোর বঙ্কিম সেইগুলি মুখস্থ করতেন ও নিজের মনে আবৃত্তি করতেন। তিনি যখন আপন মনে আবৃত্তি করতেন:

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত চরাচর।
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।।

তখন কি তিনি জানতেন যে এই ঈশ্বর গুপ্তই একদিন হবেন তাঁর সাহিত্যগুরু আর এই প্রভাকরের পাঠশালাতেই হবে তাঁর সাহিত্যসাধনায় হাতেখড়ি? অথবা কিশোর বঙ্কিম যখন সুললিত কণ্ঠে জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে 'ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী' কবিতাটি আবৃত্তি করতেন, তখন কি তিনি কল্পনা করেছিলেন যে একদিন তিনিই রচনা করবেন 'আনন্দমঠ' উপন্যাস আর ঐ উপন্যাসে তিনি উদ্ধৃত করবেন তাঁর কৈশোরকালে মুখস্থ-করা গীতগোবিন্দের এই কবিতাটি?

তিন

গঙ্গার তীরে হুগলী কলেজ।

সাড়ে এগার বছর বয়সে বাংলাসাহিত্যের ভাবী সম্রাট ছাত্র হয়ে এলেন এখানে। তখন কলেজে স্কুল ও কলেজ দুটো বিভাগই থাকত। স্কুল বিভাগটি আবার দুটি অংশে বিভক্ত থাকত — সিনিয়র ও জুনিয়র। এই ছিল তখনকার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা। তখনকার সেই যুগে অর্থাৎ সিনিয়র ও জুনিয়র মিলিয়ে এখনকার উচ্চ ইংরেজি স্কুল। হুগলী কলেজের স্কুল-বিভাগে জুনিয়রের প্রথম শ্রেণীর 'এ' সেকশনে ভর্তি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্রও পড়তেন দাদার দু'ক্লাস নীচে। দুই ভাই প্রতিদিন কাঁঠালপাড়া থেকে নৌকাযোগে গঙ্গা পার হয়ে হুগলী কলেজে যাওয়া-আসা করতেন। কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন: 'দাদা পড়াশুনায় এতদূর এগিয়ে থাকতেন যে ক্লাসের শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই তা' দেখে অবাক হয়ে যেতেন; ক্লাসের কর্তারা পাঠ্য বই তাঁর মনের খোরাক জোগাতে পারত না।'[1]

না পারারই কথা।

তখনকার দিনে স্কুলে কতখানিই বা পাঠ্যপুস্তক থাকত?

এই নবীন শিক্ষার্থীটির ছিল প্রবল জ্ঞান-পিপাসা; সেই তাঁর তৃষ্ণা দু'মলাটের পাঠ্যপুস্তকে তো মিটবার নয়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি হাতের কাছে যা পেতেন — সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি — তাই আপন মনে পড়ে যেতেন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছেন: 'আমরা বরং তাস বা সতরঞ্চ খেলে বা আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করতাম, ইনি কিন্তু সব সময়েই সেখানে একটা না একটা বই নিয়ে থাকতেন।'[2]

ভরতচন্দ্রের কবিতা বঙ্কিমের খুব প্রিয় ছিল। তিনি যখন হুগলী কলেজে

পড়তে এলেন, তখন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যখানি তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে ক্লাসে সহপাঠীদের কাছে এর অংশবিশেষ আবৃত্তি করে শোনাতেন। বঙ্কিমের গলা ছিল খুব মিষ্টি, আর বাংলা উচ্চারণ ছিল যেমন বিশুদ্ধ তেমনি সুস্পষ্ট। সহপাঠীরা তাঁর কণ্ঠে সুললিত আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হত ও আনন্দ উপভোগ করত। উত্তরকালে তিনি যখন বাঙালির জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের আসনে সমাসীন তখন একদিন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অন্নদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ-কথাটি কি? এর উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন: 'স্বর্গ থেকে আনা পরম বিশ্বাসের ছবি।'

হুগলী কলেজে ইংরেজি পড়াতেন নবীন মাস্টার।

নবীনচন্দ্র দাস। টিডি সাহেবের পর এঁর কাছেই বঙ্কিম ইংরেজি বেশী শিখেছিলেন। এই নবীন মাস্টার একদিন তাঁর ক্লাসে ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন: বলো দেখি, 'রামেরা দুই ভাই'-এর ইংরেজি কি হবে? একটি ছাত্র বাদে আর সব ছাত্র উত্তর দিলো: Rams are two brothers.

— হোল না।

সমস্ত ক্লাস চুপ।

সামনের বেঞ্চিতে বসেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

— বঙ্কিম! ডাকলেন নবীন মাস্টার।

বঙ্কিম উঠে দাঁড়ালেন। ক্লাস নিস্তব্ধ; ছাত্রদের কৌতূহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ তাঁর উপর। তিনি বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়ালেন, মাস্টার মশাইয়ের টেবিল থেকে চকখড়িটা তুলে নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের উপর মুক্তাক্ষরে লিখলেন: Ram

and his brother are two in number.

তখন নবীন মাস্টার ছাত্রদের বলেন, যাও, বঙ্কিমের পায়ের ধুলো নাও। এত করে পড়াই, তোমরা কিছুই শিখতে পার না।

স্কুলের হেড মাস্টার গোমেস সাহেব তখন ঐ ক্লাসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কি মনে হলো, তিনি হঠাৎ ক্লাসের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং ক্লাস-টিচারের কাছে সব জেনে নিয়ে বঙ্কিমের পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, you will shine, my boy.

মেদিনীপুরের টিড সাহেবও ঠিক এই কথা বলেছিলেন। হুগলী কলেজের স্কুল বিভাগের সকল শিক্ষকই একবাক্যে বলতেন, ছেলের যে রকম মেধা, বড়ো হলে এ একটা কিছু হবেই।

তাঁদের সকলের আশা ও প্রত্যাশাকে সফল করে বঙ্কিমচন্দ্র বড়ো হয়ে সত্যিই একটা কিছু হয়েছিলেন। হয়েছিলেন তিনি বাংলার সর্বকালের সাহিত্য-সম্রাট. আর বাঙালির প্রিয়তম ঔপন্যাসিক। যেমন মাইকেল হয়েছিলেন বাঙালির প্রিয়তম কবি। তিনিও একসময়ে হিন্দু কলেজের অন্যতম ছাত্ররূপে শিক্ষকদের চমৎকৃত করতেন।

প্রথম বছরের বাৎসরিক পরীক্ষার ফল বেরুলো।

দেখা গেল, পরীক্ষায় সবার দশজনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একটি পুরস্কার পেয়েছেন। সেদিন তিনি ঐ পুরস্কার হাতে নিয়ে কাঁটালপাড়ায় এলেন, সেদিন বাড়িতে সবাই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। জয়নারায়ণ তাঁর আদরের নাতিটিকে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করলেন — দাদু, এমনি করে বংশের ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করিও। যথাসময়ে

মেদিনীপুরে যাদবচন্দ্রের কাছে এই খবর গিয়ে পৌঁছল। পুত্রের গৌরবে পিতা যারপর-নাই গৌরববোধ করলেন। ছেলেকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: 'তুমি সমেরিক পরীক্ষায় general proficiency-র জন্য পুরস্কার পাইয়াছ জানিয়া বিশেষ আনন্দ বোধ করিলাম। তোমার ছাত্রজীবন যেন এইরূপ দেদীপ্যমান হয়, ইহাই আমার অন্তরের একান্ত কামনা। চাণক্য শ্লোকে পড়িয়াছ: স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। এই কথাটি মনে রাখিবে বিদ্যার আদর সর্বত্র, বিদ্বানের আদর সর্বত্র। জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘায়ু প্রদান করুন। ইতি নিত্য আশীর্বাদক তোমার শ্রীযাদবচন্দ্র দেবশর্মণ:।'

স্কুলের শিক্ষকেরাও একবাক্যে বঙ্কিমের প্রশংসা করলেন।

সব মিলিয়ে প্রায় দশটা বছর পর্যন্ত এই স্কুলে খুব কম ছাত্রই দেখাতে পেরেছে। ঈশান মাস্টার (ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন: তোমাকে আমি কিছু শিক্ষা দিলাম। মনে রেখো, বিদ্যার আরম্ভ আছে, শেষ নেই। কথাটি বঙ্কিমের হৃদয়ে চিরদিনের মতো রয়ে গেল। তিনি সত্যিই আজীবন জ্ঞান-পিপাসু ছিলেন। তাঁর অধ্যয়ন-স্পৃহা ছিল অশেষ বলায় ছিল। স্বদেশের ও পাশ্চাত্যের দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য — যা কিছু জানবার আছে সবই তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন সারা জীবন ধরে। এই বিষয়ে তাঁর যেন ক্লান্তি ছিল না, বিরাম ছিল না।

#space#

১৮৫৪। এপ্রিল মাস।

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তখন এই পরীক্ষা নির্দিষ্ট স্কুলগুলিকে আলাদা ভাবে নেওয়া হত। হুগলী কলেজে এবং এর অধীনস্থ স্কুলগুলি থেকে সেবারে মোট তিয়াত্তরজন ছাত্র এই পরীক্ষা দিয়েছিল।

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বেরুলো। দেখা গেল, পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। আটটাকা মাসিক বৃত্তি পেলেন তিনি। হুগলী কলেজে এর আগে আর কোন ছেলে পরীক্ষায় এত ভালো ফল পায়নি। যাদবচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করেছে — এই সংবাদ সারা কাঁঠালপাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল; কাঁঠালপাড়া থেকে সারা বাংলাদেশে। 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' এই নামটি তখন থেকেই শিক্ষিত মহলে পরিচিত হয়ে উঠতে থাকে।

— দাদা, তুমি আটটাকা করে স্কলারশিপ পাবে। এই টাকা দিয়ে কি করবে?

— কি করতে পারি, অনুমান করো দেখি পূর্ণ।

— তোমার মনের কথা আমি কি করে জানব, দাদা?

— প্রথম টাকাটা স্কলারশিপের মা বাবাদের হাতে দেব। তারপর থেকে যেটাকা পাব তা জমিয়ে তোমাকে একটা ঘড়ি কিনে দেব আর আমি যা দরকারী তাই কিনব। বই কিনব।

— কি বই?

— ঈশানবাবু একটা লিস্ট আমাকে করে দিয়েছেন। আগে কিনব শেক্সপীয়রের সব বই।

— দাদা, তুমি কি শেক্সপীয়রের মতো একজন লেখক হবে?

— কি যে হবো তা জানি না। তবে বড়ো হয়ে একটা কিছু যে হবো তাতে সন্দেহ নেই।

— মেজঠাকুরদা তো তাই বলেন।

শুধু স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য নয়, আরো একটি কারণে গুপ্তকবির সাথেই স্মরণীয় হয়ে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন। এই সূত্রেই 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ-প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে পারিতোষিক লাভ করেন। আগেই বলেছি, তাঁদের বাড়িতে 'প্রভাকর' আসত। তখন থেকে তিনি হয়ত মনে মনে এই ইচ্ছা পোষণ করে থাকবেন যে, বড়ো হয়ে একদিন তিনি এই কাগজের একজন লেখক হবেন।

ঈশ্বরের সেই সাধ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ হলো যখন তিনি হুগলী কলেজের সেরা ছাত্র। তখন থেকে মাঝে মাঝেই প্রভাকর-সম্পাদকের কাছে কবিতা লিখে পাঠাতেন। যেসব কবিতা তাঁর পছন্দ হতো, ঈশ্বরচন্দ্র সেগুলি ছাপতেন, দরকার হলে সংশোধনও করে দিতেন। এইভাবে একদিন সম্পাদকের হাতে অজ্ঞাতপরিচয় দুটি কিশোর কবির দুটি কবিতা এসে পৌঁছল—এর একটির লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর অপরটির লেখক দীনবন্ধু মিত্র। একজন হুগলী কলেজের, অপরজন হিন্দু কলেজের ছাত্র। সেই কবিতা দুটি পাঠ করে ঈশ্বর গুপ্তের মনে হলো যেন দুটি প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ। ছাপলেন তিনি একই সংখ্যায় সেই দুটি কবিতা।

কাঁটালপাড়ার চাটুয্যে বাড়িতে সেদিন কী উদ্দীপনা।

—বাবার লেখা বেরিয়েছে প্রভাকরে, দেখেছেন মেজঠাকুরদা?

—হ্যাঁ, সঞ্জীব, আমি আগেই দেখেছি। বেশ লিখেছে।

এভাবে ঐ প্রভাকরের পাতায় তরুণ কবিদের সঙ্গে কবিতার ভেতর দিয়ে লড়াই হতো। এমনি করেই দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র—বাংলার ভাবী নাট্যকার

এবং সেই ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে পরিচিত হয়েছিলেন [সেই] তাঁদের কিশোর বয়সে। এর অনেক দিন পরে তাঁদের কর্মস্থল খুলনায় দুজনের প্রথম আলাপ পরিচয়; সেই পরিচয় ক্রমশঃ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। দুজনে দুজনের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন।

অবসরে প্রকাশিত বঙ্কিমের কাব্য রচনার মধ্যে 'সাবিত্রী' কবিতার কিছু অংশ এখানে তুলে দিলাম:

তমিস্রা রজনী ব্যাপিল ধরণী
দেখি মনে মনে পরমাদ গণি,
বন একাকিনী বসিল রমণী
কোলেতে করিয়া স্বামীর দেহ।
আঁধার গগন ভুবন আঁধার,
অন্ধকার গিরি বিকট আকার
তুমি কাননে ঘোর অন্ধকার,
চলে না ফিরে না নড়ে না কেহ॥

এভাবে তাঁর ছাত্রজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক কবিতা লিখেছিলেন। কিছু গদ্যও। পনের বছর বয়সে প্রভাকর-কবিতা-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি যখন কুড়ি টাকা পারিতোষিক পেলেন তখন ঈশ্বরচন্দ্র একদিন তাঁকে ডাকিয়ে বলেছিলেন, বঙ্কিম, তুমি পদ্য না লিখে গদ্য লিখবে। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপদেশ শিরোধার্য করেছিলেন। তারপর তিনি আর কবিতা লেখেন নি, গদ্যই লিখেছেন। সেই গদ্যের ভাষা তিনি নিজেই তৈরি করে নিয়েছিলেন।

#space#

পরীক্ষায় মাসিক আট টাকা বৃত্তি পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] স্কুল বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীতে উঠলেন। পরের বছরের পরীক্ষাতেও দেখালেন তিনিই শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন এবং দ্বিতীয় বছরের জন্য আবার আট টাকা বৃত্তি পেলেন। তারপর তিনি উঠলেন তৃতীয় শ্রেণীতে। পরের বছর (১৮৪৬) এপ্রিল মাসে এই শ্রেণী থেকে তেরো জন ছাত্র সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা দিলেন। হুগলী কলেজ থেকে পরীক্ষায় সকল বিষয়েই কৃতিত্ব দেখিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দু'বছরের জন্য কুড়ি টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এভাবে ছাত্রজীবনে মোট ৬৭২ টাকা বৃত্তিবাবদ তিনি পেয়েছিলেন।

কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠবার পর বঙ্কিমচন্দ্র আর বেশিদিন হুগলী কলেজে পড়েননি এবং সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষাও দেননি। ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে তিনি তাঁর বাবার কথা মতো কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন ও সেখানে আইন পড়তে থাকেন। কিন্তু আইন পড়া শেষ হলো না। ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে স্থাপিত হলো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঐ বছরের এপ্রিল মাসেই প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা গৃহীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক ছাত্রের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাঁর এই কৃতিত্বে সবাই খুশি হন।

১৮৫৮। বিশ্ববিদ্যালয় বি.এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। সাত-জন [illegible] ছাত্র পরীক্ষা দিলেন এবং দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করলেন মাত্র দুজন—বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু,—দুজনেই প্রেসিডেন্সির ছাত্র। এই দুজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন। যেদিন বি.এ. পরীক্ষার ফল বেরলো সেদিন ফোর্ট উইলিয়মে এই প্রথম গ্র্যাজুয়েট দুটির সম্মানে তোপ দাগা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবনের শেষ এইখানেই।

—

চার

কোনো মানুষের জীবন ও চরিত্র, তাঁর প্রতিভা ও বুদ্ধির বিকাশ ও পরিণতি বুঝতে হলে, তিনি যে কালে জন্মগ্রহণ করেন সেই কালের ইতিহাসটা একটু জানা দরকার। বংশের পরিচয়, পিতামাতার পরিচয় যেমন মানুষের বড়ো পরিচয়, তেমনি উত্তরকালে যারা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করেন, তাঁদের জীবনের প্রধান পটভূমিকা হলো তাঁদের সামাজিক পরিবেশ।

বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মজীবনের কথা বলবার আগে ... এখানে তাঁর জীবনের প্রেক্ষাপটটি অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশের কথা কিছু উল্লেখ করব। কেননা একটা সব সময় মনে রাখবে, যে রকম সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে মানুষের শৈশবজীবন গড়ে ওঠে, সেই তার চারদিকের অবস্থা ও আবেষ্টন তার জীবনের ভবিষ্যৎ গতিকে নির্ধারিত করে, চালিত করে। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে, তাঁর বয়স বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চারদিকের সামাজিক পরিবেশটা কেমন ছিল।

১৭৫৭। পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই বাংলায় এক নতুন যুগের সূচনা হলো। ভারতের ইতিহাসে আরম্ভ হলো এক নতুন অধ্যায়। শক হুন তাতার এসেছিল একদিন এই দেশে। এসেছিল পাঠান ও মুঘল। এবার এলো ইংরেজ। এলো যে সাত সমুদ্র আর তেরো নদী পার হয়ে। ভারত সমুদ্রের উপকূলে এসে একদিন ভিড়লো তার বাণিজ্যের জাহাজ। বণিকের মানদণ্ড হাতে নিয়ে এসেছিল ইংরেজ; পলাশির যুদ্ধের পর সেই মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে। বাংলাদেশেই প্রথমে কোম্পানির রাজত্ব — ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। তারপর তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃত হয় সারা ভারতে। তারা রাজত্ব

করেছিল এতগুলো বছর।

কোম্পানির আমলে প্রসিদ্ধ ঘটনা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

বাংলা ১১৭৬ সনে (ইংরেজি ১৭৭০) এই মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটেছিল—এই জন্যে বলা হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। অজন্মা, মহামারী ও দুর্ভিক্ষে সেদিন গোটা বাংলাদেশ উজার হয়ে গিয়েছিল। নয় মাসের মধ্যে এক তেহাই লোক না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল আর চাষের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল খেতজমি। এই মন্বন্তরের ছবি এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে। মন্বন্তরের পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। তখন লর্ড কর্নওয়ালিশের আমল। নবাবী আমলের জায়গীরদারদের হাত থেকে চাষের জমি কেড়ে নিয়ে তিনি ইংরেজদের অনুগত নতুন জমিদারশ্রেণীর হাতে তুলে দিলেন একটা আইন করে। সেই আইনের নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এইসব জমিদারের বেশির ভাগই প্রজার সুখ-সুবিধার দিকে তাকাতেন না; প্রজাদের শোষণ করে নতুন মনিবকে খুশি করাই ছিল তাঁদের কাজ। এই স্বেচ্ছাচারী জমিদারদের কথাও বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন তাঁর অনেক উপন্যাসে।

এইভাবে পলাশির যুদ্ধের তেতাল্লিশ বছরের মধ্যে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে থাকে একটা বিরাট পরিবর্তন। ইতিহাসের নিয়মই এই। সেই পরিবর্তনের পথে দেখা দেয় নবযুগ। বৃহত্তম ঘটনা আর মহত্তম আবির্ভাবকে উপলক্ষ্য করেই তো আসে নবযুগ। তখনকার বৃহত্তম ঘটনা ছিল পলাশির যুদ্ধ আর মহত্তম আবির্ভাব ছিলেন একটি মানুষ। তিনি রামমোহন রায়। পলাশির যুদ্ধের পনের বছর পরে তাঁর জন্ম হয় হুগলী

জেলার রাধানগরে জন্মগ্রহণ[১]। তাঁর সময় থেকেই বাংলা তথা ভারতের আধুনিক যুগের আরম্ভ। তাই তাঁকে বলা হয় আধুনিক ভারতের জন্মদাতা। তিনিই তো এই ঘুমন্ত দেশকে প্রথম জাগিয়ে দিয়েছিলেন। নবজাগরণের শুকতারা তিনি।

রামমোহন তাঁর দূর দৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এখন ইংরেজি শেখা দরকার, ইংরেজি শিখতে না পারলে এদেশের মানুষের চিত্তের প্রসার ঘটবে না, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এদের পরিচয় সাধিত হবে না এবং এরা নতুন কালের সঙ্গে তাল রেখে কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারবে না। সেজন্য তিনিই সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়ে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা শুরু করেন এবং সরকার যাতে এবিষয়ে মনোযোগী হন, সেজন্য তিনি আন্দোলনও করেছিলেন যথেষ্ট। তাঁর সেই আন্দোলনের সুফল ফলতে দেরী হয়নি— অল্পকাল মধ্যেই ঘটতে থাকে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার. আর সেই সঙ্গে দেখা দেয় নবজাগরণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মজীবন যখন শেষ হয় তখন উনিশ শতকের অর্ধেক শেষ হয়ে গিয়ে আট বছর চলছে, দেখা যায়। এই আট বছরের মধ্যে দেশের অনেক জায়গায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার বেড়েছে; ফলে দেশের লোকের মনে ধীরে ধীরে নতুন চেতনার উদয় হতে থাকে। পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিচয় যতই নিবিড় হয়ে উঠতে থাকে, ততই এদের মধ্যে জেগে উঠল নতুন সমাজবোধ, নতুন রাজনৈতিক চেতনা। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, প্রাচীন সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রামমোহন যখন প্রতিবাদ জানালেন, তখন থেকেই এদেশে দেখা দিতে থাকে

১ হুগলী জেলায় নবযুগের বাংলার অনেক মনীষী ও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যথা— রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি।

নবযুগ বা নবজাগরণ। তিনি সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন করেই রামমোহন আমাদের সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন তার তুলনা নেই। লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে এই নিষ্ঠুর প্রথাটি চিরদিনের মতো আইন করে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের আগে নবজাগরণের পুরোধাদের মধ্যে একে একে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নামের তালিকায় আছেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি প্রখ্যাত বাঙালি সন্তানগণ। কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় ১৮১৭ সালে। এর ঠিক সতেরো বছর আগে, উনিশ শতকের সূচনাকালেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। তখনে কিন্তু সাধারণ ছাত্ররা পড়ত না। বিলেত থেকে কোম্পানির চাকরি নিয়ে যেসব সাহেব কর্মচারী আসত তাদেরই জন্য বিশেষভাবে এই কলেজটি স্থাপিত হয়েছিল।

হিন্দু কলেজ থেকেই প্রকৃতপক্ষে নবজাগরণের আরম্ভ।

এই কলেজের ছাত্রদের বলা হতো ইয়ং বেঙ্গল।

এঁরাই ছিলেন নবজাগরণের ও নতুন চিন্তার অগ্রদূত। এঁদের মনে নতুন চিন্তার সঞ্চার করেছিলেন এই কলেজেরই তরুণ অধ্যাপক। তাঁর নাম ডি রোজিও। হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও। ছাত্রদের ওপর এঁর উপদেশের প্রভাব হয়েছিল প্রচণ্ড। ডিরোজিও ভারতবর্ষকেই তাঁর স্বদেশ বলে জানতেন ও মানতেন। সাধারণ স্কুল-মাস্টারি

তিনি করেননি- তিনি চেয়েছিলেন এই অধঃপতিত ও আত্মবিস্মৃত জাতির কল্যাণ। ছাত্রদের তিনি সেই পথেই উৎসাহ দিতেন। স্বাধীনভাবে তাদের চিন্তা-শক্তি ও যুক্তিবোধকে জাগিয়ে দিয়ে তিনি সে যুগের বাংলার ইংরেজিশিক্ষিত তরুণদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন প্রখর যুক্তি ও বুদ্ধিবাদের পতাকা। ফুলের পাপড়ির মতো দলে দলে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তাদের চিত্তশতদল। সেই শতদলের সুবাসে ভরে গিয়েছিল বাংলার আকাশ-বাতাস, বাঙালির মনোলোক।

এরই নাম নবজাগৃতি বা নব জাগরণ। বিকশিত ও সৌরভযুক্ত সেই মনুষ্য শতদলই হলো নবজাগরণ। সকল সংস্কার-মুক্ত, নব চেতনায় উদবুদ্ধ সেই তরুণদের মনের স্বর্ণবেদীর উপরেই স্থাপিত হয়েছিল নব-জাগরণের আসন। স্বাধীন চিন্তার বিকাশ, এইটাই ছিল নবজাগরণের মূল কথা। বাংলার নবজাগরণের এইটাই ছিল মূল উপাদান।

জ্ঞানের ও চিন্তার প্রবল স্রোত বইতে থাকে তখন থেকেই। সত্যের জন্য জীবন কিংবা মৃত্যু — এই ছিল তাঁর ছাত্রদের প্রতি ডিরোজিওর বাণী। সেই বাণী তাদের অন্তরে সঞ্চারিত করে দিয়েছিল নতুন উন্মাদনা আর তীক্ষ্ণ শাণিত বুদ্ধি। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যদিও অনেক বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন সত্য, তাঁদের অনেকেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তেমনি একথাও সত্য যে, এঁরাই ছিলেন বাংলায় নবজাগরণের প্রথম পথ-প্রদর্শক। এই হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে যেমনি বাঙালি পেয়েছিল নবযুগের প্রথম মহাকবি মাইকেল মধুসূদনকে আর প্রথম নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে। তেমনি স্বামী

কলেজের ছাত্রদের মধ্যে থেকে আমরা পেয়েছি নবযুগের প্রথম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রকে। এঁদের প্রত্যেকেই যেন এই যুগের নব দ্রষ্টা ছিল।

বীরসিংহ থেকে বিদ্যাসাগর যখন পায়ে হেঁটে তাঁর বাবার হাত ধরে কলকাতায় এলেন সংস্কৃত কলেজে পড়তে তখন গোলদীঘির ধারে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ পাশাপাশি ছিল। প্রচলিত কুসংস্কারে ভরা ধর্মের ও সমাজের বিধিনিষেধ তখন ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছিল। যুক্তি আর স্বাধীন চিন্তা — এই ছিল সেই যুগের দুটি প্রধান লক্ষ্য। প্রথার দাসত্ব নয়, অন্ধবিশ্বাসের অনুগামী হওয়া নয় — তার জায়গায় তখন এসে গিয়েছে শাণিত যুক্তি, মার্জিত বুদ্ধি আর সবলে সংস্কারমুক্ত বিচারমুখী মন।

এই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মকাল ও তাঁর ছাত্রজীবনের সামাজিক পরিবেশ। কলকাতার রেনেসাঁসের হাওয়া যেদিন দেশের সর্বত্র ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হচ্ছিল। কাঁঠালপাড়ার চাটুজ্যে পরিবারের মধ্যে যদিও এই হাওয়ার ঢেউ তখনো পর্যন্ত পৌঁছয়নি, তবে বঙ্কিমচন্দ্র সেই পরিবারের অন্যতম সন্তান হয়েও এর যে স্পর্শ পেয়েছিলেন তা ঠিক। তিনিও একজন প্রখর যুক্তিবাদী ও স্বাধীনচিন্তার উপাসক হয়ে উঠেছিলেন। নবজাগরণের দীপ্তি তাঁর ললাটদেশকে স্পর্শ করেছিল। তাঁর ছাত্রজীবনেই এর প্রমাণ দেখা গিয়েছিল। তাই তো তিনি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠতম চিন্তানায়ক রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ও মাইকেলের মতো তিনিও ছিলেন নবজাগরণ যুগেরই এক সন্তান। একদিকে পারিবারিক ঐতিহ্য আর অন্যদিকে সামাজিক পরিবেশ — এর মধ্যে দিয়েই বিকশিত হয়ে উঠেছিল বঙ্কিম-মানসলোক।

—

পাঁচ

যে বছরে বঙ্কিম বি. এ. পাশ করেন, সেই বছরে এই উপমহাদেশে কোম্পানি উঠিলিয়ায়ে তাজ দখল হয়েছিল, এ কথা আগেই বলেছি। তেমন পড়লেই কথা — বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট তিনি, এ কী কম সম্মানের কথা! সেই সম্মান আরো বৃদ্ধি পেলো যখন ঐ বছরেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেলেন। এইবার আমরা শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলব।

বাংলার প্রথম বি. এ. পাশ-করা ডেপুটি তিনি।

বাঙালির প্রথম ঔপন্যাসিকও তিনি।

এই দুটি দুর্লভ গৌরবে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে বঙ্কিমের কর্মময় জীবন। তিনি বি. এ. পাশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের সেক্রেটারি একদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। এই চিঠিতে তাঁকে তাঁর সুবিধামত যথাশীঘ্র লাটভবনে এসে ছোটলাটের সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র যখন কলেজে পড়তে এলেন তখন এখানে থাকার জন্য একটা আলাদা বাসা করা হয়। বাড়ির পুরাতন ভৃত্য তুলসী সঙ্গে এসেছিল পাচক বৃন্দাবন। পরীক্ষার ফল যখন প্রকাশিত হয় তিনি তখন তাঁদের কলেজের বাসায় অবস্থান করছিলেন। ঐ ঠিকানায় যখন চিঠি এলো তাঁর নামে, তখনি শীলমোহর-আঁটা একখানা সরকারী। তখন সেটি পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দাদা সঞ্জীবচন্দ্রের হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দাদা, তুমি কি বলো?

— লাটসাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন, যাওয়া উচিত।

- কিন্তু কি জন্যে এই অর্ডার তাতো বুঝতে পারছি না।

- আমি কিন্তু তার অনুমান করতে পারি।

- কি?

- লাট সাহেব নিশ্চয়ই তোমাকে চাকরি দিতে চাইবেন।

- কিসের চাকরি, দাদা?

- ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি।

সঞ্জীবচন্দ্রের অনুমানই সত্য হলো। নির্ধারিত দিনে বঙ্কিমচন্দ্র যখন লাটভবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন ছোটলাট হ্যালিডে তাঁকে খুব শিষ্টাচারের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রথম স্নাতক হওয়ার গৌরব লাভ করেছেন, তজ্জন্য লাট সাহেব তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। তারপর বললেন, আপনাকে সরকারী চাকরি দেওয়া হবে। — কি ধরনের চাকরি?

— Executive service. আপনাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি দেওয়া হবে।

— ধন্যবাদ। কিন্তু আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা না করে আমি এবিষয়ে কিছু বলতে পারি না, ইওর এক্সেলেন্সি।

সেদিন ঐ পর্যন্ত।

তারপর বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় এসে তাঁর বাবাকে সব কথা বললেন। যাদবচন্দ্র তখন সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। ছেলেকে

তিনি সরকারী চাকরি গ্রহণ করতে পরামর্শ দিলেন। বললেন, তোমার বয়স এখন অল্প, এই বয়সে চাকরিতে ঢুকলে পরে হয়ত তুমি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পেতে পারবে।

কিন্তু চাকরি নিতে প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের মন সায় দিচ্ছিল না; পরে যাদবচন্দ্র ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কথায় শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ চাকরি নিতে রাজী হলেন।

space#

১৮৫৮, ৭ আগস্ট।

বঙ্কিমচন্দ্র এইবার কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন।

তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর। সেই দিনটি থেকে পরবর্তী তেত্রিশ বছর কাল তিনি সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে সরকারী চাকরি উপলক্ষে তিনি আটটি জেলার বিভিন্ন স্থানে বদলী হয়েছেন। প্রতাপাদিত্যের যশোর ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কর্মস্থল। পিতামাতার প্রতি তাঁর খুব ভক্তি ছিল। তাই প্রথমবার কর্মস্থলে যাওয়ার সময়ে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের পাদোদক। সেকালের যত মহাপুরুষ তাঁদের সকলেই পিতামাতাকে খুব ভক্তি করতেন — তাঁদের প্রত্যক্ষ দেবতা বলে মানতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন বিয়ে করেছেন। তিনি যখন হুগলী কলেজের ছাত্র তখনই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। সেকালে আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের খুব কম বয়সে বিয়ে হত। বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র এগার বছর আর স্ত্রীর বয়স পাঁচ।

যশোরে যখন চাকরি নিয়ে যান তখন ঐ স্ত্রীর বয়স চৌদ্দ বছর। স্ত্রী সঙ্গে যেতে চাইলেন।

— তুমি চাকরিতে যাচ্ছ, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না?

— আমি খুলনায় নতুন যাচ্ছি। বিদেশ-বিভুঁই। বছর দুই বাদে তোমাকে নিয়ে যাব। তখন তোমাকে নিয়ে সেখানে সংসার পাতব।

কিন্তু স্ত্রীর এই আশা আকাঙ্খাই থেকে গিয়েছিল, সত্যে পরিণত হয়নি। অল্পদিন পরেই বাড়ির একটি চিঠিতে তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র দারুণ শোক পেলেন। তাঁর জীবনে সেই প্রথম শোক। খুলনায় বসে নির্জনে তিনি স্ত্রীর জন্য কত কাঁদলেন। এই ঘটনার আট মাস পরে, পিতামাতার আদেশে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। তাঁর সেই দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল রাজলক্ষ্মী দেবী। রূপে ও গুণে তিনি লক্ষ্মীর মতোই ছিলেন। বিয়ের পর নব-পরিণীতা স্ত্রীকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কর্মস্থল খুলনায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনার হাকিম তখন প্রবলে চলছিল নীলকর সাহেবদের উপদ্রব। নীলকর আর ছিল কারা?

সেকালে অনেক সাহেব নীলের চাষ করত — চাষীদের কাছ থেকে তাদের জমি কেড়ে নিয়ে বা নামমাত্র দামে কিনে নিত। তাদের সাহায্যে নীলের চাষ করা হলো। সেই নীল তারা বিলেতে চালান দিয়ে লাখ লাখ টাকা রোজগার করত। এই নীলকর সাহেবেরা অনেক জায়গায় নীলকুঠী

শাসন করেছিল আর ওরা প্রজাদের ওপর করত ঘোর অত্যাচার। ওদের সেই অত্যাচারের কাহিনী নিয়েই দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত নাটক – 'নীলদর্পণ'। নীলকর সাহেবদের মধ্যে তখন মরেল সাহেবের খুব প্রতিপত্তি ছিল। যশোরের একটি অঞ্চলে একটি নগর বসিয়ে তিনি তার নাম রেখেছিলেন মরেলগঞ্জ। ঐ অঞ্চলটা ছিল হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রের এলাকাভুক্ত।

মরেলগঞ্জের কথা তিনি আগেই কানে কিছু শুনেছিলেন। এখন খুলনায় এসে তরুণ হাকিম স্বচক্ষে দেখলেন মরেল সাহেবের কী দোর্দণ্ড প্রতাপ। তিনি যেন একজন ছোটখাটো জমিদার – লাঠিয়াল পোষেন, সৈন্য রাখেন, বন্দুক-সড়কির সংখ্যাও তাঁর কম নয়। একদূর হলো বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় আছেন। এমন সময়ে একদিন সদরে খবর এলো যে মরেলগঞ্জে দাঙ্গা বেধেছে – মরেল সাহেবের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রজারা হাঙ্গামা বাধিয়েছে। আসলে দাঙ্গাটা বাধিয়েছিলেন মরেল সাহেব নিজে।

দাঙ্গাটা হয়েছিল খুলনার বড়ো গ্রামে। বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর ছিল এই দাঙ্গার তদন্তের ভার। দাঙ্গার পর মোকদ্দমা হয়। হাকিম স্বয়ং পুলিশ নিয়ে সেই গ্রামে তদন্ত করতে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, মরেল সাহেবের মাইনে-করা লাঠিয়ালরা গ্রামে অবাধে লুণ্ঠন চালিয়েছে, মেয়েদের ওপর করেছে অত্যাচার। দাঙ্গাকারী অনেক সাহেব দোষী। বঙ্কিমচন্দ্র সেইসব দোষী সাহেবের নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা (warrant) বের করলেন। তখন তাঁকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা

হয়, এমন কি তাঁর জীবননাশের ষড়যন্ত্র পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু হাকিম নির্ভীক। মরেল সাহেবকে তিনি শাস্তি দিয়েছিলেন এবং অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে তাঁদের প্রতাপ খর্ব করে দিয়েছিলেন চিরকালের মতো। খুলনায় তখন চোর ডাকাতদেরও ভীষণ উপদ্রব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কঠোর হাতে সেই উপদ্রব দমন করেছিলেন। তাঁর এইসব কাজে সরকার খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর উপরওয়ালা ম্যাজিস্ট্রেটের সুপারিশে বঙ্কিমচন্দ্রের মাইনে একশো টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৪/৯০০০

খুলনার পর তিনি বদলি হয়ে গেলেন বারুইপুরে।

চব্বিশপরগনার একটি সাবডিভিশন। খুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র হাকিম হিসেবে যে সুনাম কিনেছিলেন, বারুইপুরে আসার পর তাঁর সেই সুনাম, আরো বৃদ্ধি পেলো। এখানে আসার সাতমাস পরে এই অঞ্চলে প্রবল ঝড় ও বন্যা হয়। ঝড়ে অনেক ঘরবাড়ি ভেঙে যায়। ঝড়ে ও বন্যায় অনেক লোকও মারা যায়। সরকার থেকে রিলিফের ব্যবস্থা হলো। সেই রিলিফের কাজের দায়িত্ব ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উপর। ক্ষতি হয়েছিল সবচেয়ে বেশি ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলে। তাই কিছুদিনের জন্য তাঁকে বারুইপুর থেকে এখানে বদলি করা হয়েছিল।

ত্রাণকার্যের (Relief) কাজে তিনি খুব দক্ষতার পরিচয় দিলেন। সকলেই তাঁর কাজের প্রশংসা করল। আবার তাঁর মাইনে বাড়ল,

পদোন্নতি হলো। এরপর তিনি তৃতীয় শ্রেণীর অস্থায়ী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেন। চব্বিশ-পরগনার জেলাশাসক তাঁর বার্ষিক রিপোর্টে বঙ্কিমচন্দ্রের কাজের খুব প্রশংসা করলেন। অল্পদিনের মধ্যে চাকরিতে উন্নতি হয়। পুত্রের বেতনবৃদ্ধি ও পদোন্নতির সংবাদে যাদবচন্দ্র খুব খুশি হলেন।

খুলনার কাজ শেষ হলে আবার তিনি ফিরে এলেন বারুইপুরে। এখানে তিনি প্রায় তিন বছর কাটালেন। এইসময়ে সরকারী কর্মচারীদের মাইনে বাড়ানোর জন্য একটি কমিশন বসেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কমিশনে সেক্রেটারির কাজও করেছিলেন। তারপর বারুইপুর থেকে তিনি বদলি হয়ে গেলেন চব্বিশ-পরগনার সদর আলিপুরে। এখানে বছর দুই কাজ করার পর তাঁকে মুর্শিদাবাদে বদলি করা হয়। এই জেলার সদর বহরমপুরে।

এখানে তিনি একাদিক্রমে প্রায় সাড়ে চার বছর ছিলেন। সেকালের সেই প্রাচীন নবাব সিরাজদৌলার স্মৃতি-বিজড়িত মুর্শিদাবাদে এসে, আমরা অনুমান করতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে বাংলার ইতিহাসের একটি করুণ অধ্যায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, কারণ তাঁর ছিল প্রখর ইতিহাস-সচেতন মন। বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মজীবনে এই বহরমপুরে অবস্থান স্মরণীয় হয়ে আছে একটি বিশেষ ঘটনার জন্য — এখান থেকে তিনি বের করতে শুরু করেছিলেন যুগান্তকারী মাসিক পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন'। এই বিষয়ে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট বেনব্রিজ সাহেব তখন বহরমপুরের জজ ছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের খুব গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং দুজনের মধ্যে খুব

হয়েছিল খুব। বহরমপুরে থাকার সময়কার একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। সেই ঘটনায় হাকিম হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল। দৃঢ়তা এবং নির্ভীকতা। ঘটনাটি এই:- তখন সেখানে একটা সেনানিবাস ছিল। স্থানীয় লোকেরা এর নাম দিয়েছিল গোরা ব্যারাক। কর্নেল ডাফিন নামে একজন এক মিলিটারি সাহেব ছিলেন ব্যারাকের কমান্ডান্ট। ব্যারাকটির সামনে দিয়ে একটা সরু রাস্তা গিয়েছে। এই রাস্তাটা দিয়ে কাছারী গেলে খুব কম সময়ের মধ্যে যাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাই এই পথ দিয়ে কাছারী যেতেন কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বা পালকী চড়ে। আরো অনেকেই এই পথটি দিয়ে যাওয়া-আসা করত।

গোরাদের এতে আপত্তি ছিল। কিন্তু এটি ছিল সরকারী সড়ক। তাই আপত্তি করলেও জোর করার কিছু ছিল না। একদিন বিকেল বেলায় বঙ্কিমচন্দ্র কাছারীর কাজ সেরে ঐ পথ দিয়ে বাসায় ফিরছিলেন পালকী চড়ে। পালকীর একদিকের দরজা বন্ধ। পালকীটা যখন রাস্তার মাঝামাঝি এসেছে, তখন কে যেন টোকা মারল পালকীর বন্ধ দরজার ওপর। তৎক্ষণাৎ সেইদিকের দরজা খুলে বঙ্কিমচন্দ্র লাফ দিয়ে মাটিতে নামলেন। দেখেন, সম্মুখে একজন মিলিটারি সাহেব।

এই সাহেব কর্নেল ডাফিন।

—কে তুমি? ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করেন হাকিম।

—I am Col. Duffin—commandant of the barrack.

—How dare you knock my palanquin?

ডাফিন তখন হাত দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর

কাছে সাহেবের উদ্ধত। এই অশিষ্ট আচরণ অসহ্য বোধ হলো। তিনি কর্নেলের নামে ফৌজদারীতে নালিশ করলেন। এই ঘটনাটি নিয়ে বহরমপুরে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। সাহেবের বিরুদ্ধে নালিশ! তাও আবার মিলিটারি সাহেব। ইংরেজ মহলেও হুলস্থূল পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত জজ বেভ্রিজ সাহেবের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটি মিটমাট হয়ে যায়। কর্নেলকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল, তবে না তিনি অব্যাহতি লাভ করেন। মোকদ্দমা তুলে নেওয়া হয়।

এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল হাওড়ায়।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন হাওড়ায় বদলি হন তখন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বাকল্যান্ড সাহেব। এই বাকল্যান্ড সাহেবের সঙ্গে তাঁর যেন কোনোই বনত না। অনেকবার অনেক ব্যাপার নিয়ে জেলা-শাসকের সঙ্গে ডেপুটির বিরোধ বেধেছে আর প্রত্যেকবারই বঙ্কিমচন্দ্র নিজের মর্যাদা বজায় রেখে জয়লাভ করেছেন। এইজন্যই তাঁকে বলা হতো দুঁদে হাকিম। ডেপুটি হলে কি হয়, তাঁর তেজ কারো কম ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র চিরকাল পুলিশের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। পুলিশ এবং পিনালকোড — এই দুটি বিষয়ে তাঁর ছিল বিরূপ সমালোচনা। এ তাঁর চাকরি-জীবনেরই তিক্ত অভিজ্ঞতার ফল। তিনি দেখেছেন ইংরেজের পিনালকোডে সুবিচার নেই — আছে শুধু অবিচার। পিনালকোডের প্রকৃত দোষী ব্যক্তির সাজা হয় না — সাজা পায় নির্দোষী ব্যক্তি। পুলিশকেও তিনি বিশ্বাস করতেন না।

তাঁর বদনামের স্ফুলিঙ্গ মনে আর রইল না — তিনি মামলা মোক-
অলি প্রায়ই ছেড়ে দিতেন। পুলিশের উপরওলা মহাখাপ্পা। যশোহর শহরের
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের নির্দেশে আলীকুটের এক বৃদ্ধাকে সোপর্দ
করল ফৌজদারীতে। তার অপরাধ সে গোলপাতা দিয়ে একখানা ঘর তৈরি
করেছিল। তখন মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে ঐ রকমের ঘর তৈরি করা নিষিদ্ধ
ছিল এবং ঐ মর্মে শহরে নোটিশও (দিয়েছিল) জারি করে। সহজেই আগুন লেগে
যায় বলে ঐ রকম দাহ্য পদার্থ দিয়ে শহরের এলাকার মধ্যে গোলপাতার ঘর
বিপজ্জনক ছিল বলে ঐ জাতীয় ঘর তৈরি নিষিদ্ধ হয়েছিল।

ইংরেজি / কিন্তু ঐ নোটিশে, 'combustible' কথাটির বাংলা করা হয়েছে
'জ্বলনীয় পদার্থ।' গোলপাতার কুটিরবাসিনী ঐ বৃদ্ধার হাতে যখন নোটিশটি গিয়ে পৌঁছল
তখন প্রথমে সেই বৃদ্ধাকে ঘর ঘর বুঝিয়ে দিয়ে বলল, সে যেন জল দিয়ে তার ঘরটা
না ছোঁয়। বৃদ্ধা সেই বিশ্বাসেই তার গোলপাতার ঘরে জল লাগাতে দিতনা, অথচ
আইনমত এই জাতীয় দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি ঘর সব সময় জল দিয়ে [illegible]। এই
মামলা উঠলো মফিজউদ্দীনের এজলাসে। তিনি বুঝলেন বৃদ্ধাকে মিছামিছি
হয়রানি করা হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির ইংরেজ সেক্রেটারি ঐ combustible
কথাটির ঐ রকম বাংলা করার দরুনই যে এই অনর্থ ঘটেছে, সেটা হাকিমের বুঝতে
দেরী হলো না। তিনি বৃদ্ধাকে বেকসুর খালাস দিলেন। রায়ে লিখলেন, যেহেতু
নোটিশটি খুব পরিষ্কার হয়নি, আমি সেই বৃদ্ধাকে অব্যাহতি দিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তো চটে আগুন। তিনি তখনি এই মামলার
নথিপত্র তলব করলেন ও হাকিমের রায়ের উপর এই মর্মে একটা মন্তব্য লিখলেন:

'যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভালো বাংলা লেখেন, বলে গর্ব করেন, সেজন্য প্রথম দিনের বিভ্রাট ঘটেছে।' এই ঘটনাটি যখন ঘটেছিল তখন বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আসন সত্যিই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওই ম্যাজিস্ট্রেটের এই অশিষ্ট মন্তব্য তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাকল্যাণ্ডকে লিখে পাঠালেন — 'আপনি আমার নিজের বিভাগীয় মনিব নন। আমার কাজের ওপর এই রকম মন্তব্য প্রকাশ করবার কোন অধিকার আপনার নেই। যদি আপনি প্রমাণের মধ্যে ক্ষমা না চান, তাহলে আমি কমিশনার সাহেবের গোচরে এই বিষয়টি নিয়ে আসতে বাধ্য হব।'

বাকল্যাণ্ড ক্ষমা চাইলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রও নাছোড়বান্দা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে তিনি কোনদিন ভয় পেতেন না। এই ছিল তাঁর স্বভাব। বাকল্যাণ্ড বেলা শাসক আর তিনি সামান্য ডেপুটি মাত্র — এটাই ভাবতেন; কিন্তু তিনি এর প্রতিকার চাইলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই কমিশনার সাহেব বাঁকুড়া এলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। কমিশনার তাঁর অধীনস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের এই অসঙ্গত আচরণ সমর্থন করলেন না। বাকল্যাণ্ড অগত্যা তাঁর সেই অশিষ্ট মন্তব্য ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন। শুধু তাই নয়। তাঁকে দুঃখও প্রকাশ করতে হল তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে।

/তিনি।
(এইভাবেই সরকারি চাকরিতে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে চলতেন/

১৮৮৩ সালে তিনি যখন দ্বিতীয়বার হাওড়ায় বদলি হয়ে গেলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মাইনে আটশো টাকা। এর পাঁচ বছর পরে তিনি আবার আলিপুরে বদলি হন। বেকার সাহেব তখন চব্বিশ —

সরকারের ম্যাজিস্ট্রেট। তখন জেলার রাজস্ব বিভাগেরই দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। বার্ষিক বিবরণী দেওয়ার সময় হলো। কিন্তু সময়ে রেভিনিউ স্টেটমেন্ট তৈরি হলো না। রেভিনিউ বোর্ড থেকে তাগিদের পর তাগিদ আসতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র নির্বিকার। তিনি ঐসব তাগিদের কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে বোর্ডের সাহেব নিজেই কৈফিয়ত জানতে চাইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, রেভিনিউ স্টেটমেন্ট তৈরি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু নির্ভুল হিসাবে তৈরি করতে বেশ সময় দরকার। ম্যাজিস্ট্রেট তখন আমলাদের কাজ স্বচক্ষে পরিদর্শন করলেন। দেখে তিনি সন্তুষ্ট হলেন ও বোর্ড অফিসে সব কথা লিখে জানালেন।

তাঁর এজলাসে কোন উকিল বা ব্যারিস্টারের অশোভন কথার সাহস থাকত না। অনেক উকিলের এক অভ্যাস আছে যে তাঁরা হাকিমের সামনে হাত-মুখ নেড়ে, টেবিল চাপড়িয়ে তাঁদের মক্কেলের বক্তব্য পেশ করে থাকেন। আলিপুরে একবার একটি মোকদ্দমায় একজন ইংরেজ ব্যারিস্টার এসে আসামীর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্যারিস্টারী আচরণে সোহরতের অভ্যস্ত ছিল। সেটি হাকিমের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি ~~[illegible]~~ অহেতুক টেবিল চাপড়িয়ে, হাত-মুখ নেড়ে আর নানা ভঙ্গিতে সাক্ষীকে জেরা করছিলেন। হঠাৎ তিনি কি একটা প্রশ্ন করে বসলেন সাক্ষীকে। সে উত্তর দেওয়ার আগেই বিচারকের আসন থেকে গম্ভীর স্বরে বঙ্কিমচন্দ্র বলে উঠলেন: এ প্রশ্ন অবান্তর।

— অবান্তর! Irrelevant! বিস্ময়ে বললেন আসামীপক্ষের সেই কৌঁসুলী।

—নিশ্চয়ই অন্তর। আর আপনার ভঙ্গিও অশোভন। মনে রাখবেন এটা বিচারালয়, বৈঠকখানা নয়। জানেন না ম্যাজিস্ট্রেট হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে সম্বোধন করতে হয়? আমি আপনার বিরুদ্ধে আদালতকে অবমাননার অভিযোগ আনতে পারি।

হাকিমের সেই কঠিন স্বরের মূর্তি দেখে আর ঐ কথা শুনে অত্যন্ত তেজী ইংরেজ ব্যারিস্টার সাহেবকে নির্বাক হয়ে গেলেন।

আর এজন্যই প্রকাশ্যে জনৈক উকিল বঙ্কিমচন্দ্রকে খোশামোদ করে বলেছিলেন - হুজুর, আপনি হাকিম, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সকলেই অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, তা ঠিক। তবে বড়কর্তা এখানে হাইকোর্ট রয়েছেন। তাই বলে আমাকে দুনিয়ার বাদশা বলে মনে করবার কোন হেতু দেখি না। উকিল বাবুটি সেদিন খুব লজ্জা পেয়েছিল। তিনি যখন দ্বিতীয়বার হাওড়ায় বদলি হয়ে আসেন তখন অন্য বিলেত থেকে আসা এক ছোকরা হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বংকিম' বলে ডেকে অপমান করেছিলেন। তিনি সেই ইংরেজ হাকিমের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে মামলা দায়ের করেছিলেন। সাহেবটিকে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র এইরকম হাকিমই ছিলেন।

এমন ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ এবং স্বাধীনচেতা বিচারক তাঁর সময়ে খুব কমই ছিলেন।

ছয়

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুত বেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

— কি লিখছ?

— নবেল।

— তা বাংলায় কেন?

— হ্যাঁ বড়বৌ, বাংলাতেই লিখব। ইংরেজিতে আর লিখবনা।

— কেন, হাকিম সাহেব?

— বাঙালী হয়ে ইংরেজিতে লিখে কি লাভ? আমার দেশের লোকই যদি পড়তে না পারল তবে সে লেখার সার্থকতা কোথায়? ঈশ্বরচন্দ্র আমাকে এই উপদেশই দিয়ে গেছেন।

খুলনায় একদিন স্বামী ও স্ত্রী, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী দেবীর মধ্যে এই রকম কথোপকথন হচ্ছিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কাছারী থেকে ফিরে এসে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পড়ার ঘরে গিয়ে বসলেন। ভৃত্য সুরলী রূপো বাঁধানো গড়গড়ায় তামাক সেজে দিয়ে গেলো। গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়ে কিছুক্ষণ টানলেন তিনি নিবিষ্টচিত্তে। ইতিমধ্যে লিখবার সরঞ্জাম সব গুছিয়ে রেখে নিঃশব্দে সুরলী। সুন্দর একখানি বাঁধানো খাতা— খাতার মলাটের ওপর ছবি, অক্ষর যুক্ত একটি নাম: ফুটে উঠল দেখতে দেখতে 'দুর্গেশনন্দিনী'।

ভবিষ্যতের সাহিত্য-সম্রাট তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। এতদিন তিনি একটি ইংরেজি পত্রিকায় একখানা উপন্যাস লিখছিলেন ধারাবাহিকভাবে। সেই উপন্যাসের নাম : Rajmohan's Wife.

কিন্তু হঠাৎ একদিন মাইকেল মধুসূদনের কথা মনে পড়ল তাঁর। তিনিও তাঁর কবি-জীবন আরম্ভ করেছিলেন ইংরেজিতে কাব্য রচনা করে। পরে নিজের সেই ভুল বুঝতে পেরে, বাংলাভাষায় লিখতে আরম্ভ করেন। আসলে সেই যুগটাই ছিল ইংরেজিয়ানার যুগ। ইংরেজি পড়া, ইংরেজিতে কথা বলা, এমন কি ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখা — বাঙালি [এই রকম] তৈরী হয়ে উঠেছিল। প্রথম ইংরেজি শিখে বাঙালি তার মাতৃভাষাকে প্রায় অবহেলা করতেই শিখেছিল। বাংলাভাষার চর্চা তখনকার ইংরেজি-শেখা অনেক বাঙালিই করতে চাইত না। তাঁদের অনেকের মনে এই রকম ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, বাংলা ভাষা একটা ভাষাই নয়।

এই রকম মনোবৃত্তির ব্যতিক্রম ছিলেন কয়েকজন; এঁদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম আগে মনে আসে। এঁরা এই দলে ছিলেন না। এমন বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সেই যুগে বাংলা ভাষার যে উন্নতি হয়েছিল তা তাঁর অক্ষয়কীর্তি চিরকাল এ জাতির মনে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রেখেছে। যুগের হাওয়া মাইকেলকে যেমন ভ্রান্তপথে পরিচালিত করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রকেও তেমনি করেছিল কিছুকাল। তার পর দেবী বীণাপাণি যেমন মাইকেলকে স্বপ্নে বলে দিয়েছিলেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলে থাকবেন, পরের ভাষায় কেন লিখছ? বাংলার ছেলে হয়ে মাতৃভাষাকে অনাদর করছ? তোমার নিজের ভাষায় লেখ; ভাষা যদি না থাকে, সৃষ্টি কর। সেই শক্তি নিয়েই তুমি জন্মেছ। তুমি যে আমার বরপুত্র।

Space

নভেল তো লেখা হলো, এখন জিনিসটা কি দাঁড়ালো সেটা জানা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র এই কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে কাঁঠালপাড়ায় এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি। তাঁর দুই অগ্রজ ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রকে তিনি তাঁর এই নিভৃত সাহিত্যপ্রয়াসের কথা আগেই জানিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন সাহিত্যরসিক। বঙ্কিমচন্দ্র নভেল লিখেছেন - এটা তাঁদের শোনা দরকার। তাই তাঁরাও যে যাঁর কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি এলেন। পিতা যাদবচন্দ্র ও প্রবীণ পিতামহ রামনারায়ণও এই কথা শুনলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখেছেন, এই কথাটা জানাজানি হওয়ার পর চাটুয্যে বাড়িতে যেন একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল - ঠিক যেমন চাঞ্চল্য এর আগে একবার দেখা দিয়েছিল তাঁর বি. এ. পাশ করার সময়। কাঁঠালপাড়ার দু'একজন পণ্ডিতদের কাছেও সংবাদটা পৌঁছল - যাদবচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলাভাষায় একখানা উপন্যাস রচনা করেছেন। কাঁঠালপাড়াতে সত্যিই সেদিন রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

- তাহলে তো সবাই মিলে বইটা শুনতে হয় একদিন, বললেন শ্যামাচরণ।

- শুধু আমরা শুনলে হবে না, দাদা। দু'একজন পণ্ডিত শ্রোতা থাকা দরকার, কি বলুন? বললেন সঞ্জীবচন্দ্র।

শ্যামাচরণ সায় দিলেন। পূর্ণচন্দ্রের উপর ভার দেওয়া হলো ভাটপাড়ার কয়েকজন পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করার জন্য। বিশেষ করে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে। তিনি ছিলেন তৎকালের দিনে ভাটপাড়ার একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। এই বই পড়ার প্রসঙ্গে কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন:

এই সময়ে বড়দিনের কি মহরমের ছুটিতে আমার মনে নাই, অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন আমাদের বাটিতে। তন্মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার হস্তলিখিত 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁহাদের নিকট পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে নিঃশব্দে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। কেহ ঐ ঘরে প্রবেশ করিলে শ্রোতাগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন।

এইভাবে দু'দিন ধরে বইটির পাণ্ডুলিপি পড়া হয়েছিল।

বইপড়া শেষ হলো।

লেখক তখন শ্রোতাদের মতামত জানতে চাইলেন।

কথিত আছে, উপন্যাসের চিত্তাকর্ষক কাহিনী শ্রোতাদের এমন তন্ময় করে রেখেছিল যে, তাঁরা আহার পর্যন্ত খেতে ভুলে গিয়েছিলেন ঐ সময়ে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে পণ্ডিতদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন: ব্যাকরণের দোষ-ত্রুটি কিছু লক্ষ্য করলেন আপনারা?

—গল্প ও লেখার কৌশলে আমরা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, আমাদের দৃষ্টি কি অন্যদিকে মন নিবিষ্ট করি। মন্তব্য করলেন স্মার্তিক।

—আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণদোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই-সেই স্থানে লেখা আরো মধুর হইয়াছে।' বললেন চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন।

—দাদা, আপনার কি অভিমত? শ্যামাচরণকে জিজ্ঞাসা করলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

—নভেল উৎকৃষ্ট হয়েছে, তবে এখনি ছাপবার প্রয়োজন নেই।

অগ্রজের এই কথায় বঙ্কিমচন্দ্র মনে মনে একটু নিরুৎসাহ বোধ করলেন। বই ছাপা না হলে লোকে পড়বে কি করে? কাঁটাল পাড়ার বৈঠক শেষ হলে তিনি গেলেন কলকাতায়। এখানে তাঁর এক বন্ধু থাকতেন; নাম ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, তবে সাহিত্যরসিকও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এলেন বন্ধুর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে। বন্ধুকে তিনি আগেই একটি চিঠিতে তাঁর এই উপন্যাস রচনার কথা জানিয়েছিলেন এবং আরো লিখেছিলেন যে, ছাপবার আগে তাঁকে একবার পড়ে শোনাবেন। তখন সকালবেলা যখন তিনি গেলেন।

- এসো, এসো বঙ্কিম। কী খবর?

- তোমাকে বই শোনাতে এলাম, ক্ষেত্র। শুনবে তো?

- শুনব না! ইউনিভার্সিটির প্রথম গ্র্যাজুয়েট তুমি, তুমিই আমার বাংলা দেশের প্রথম ঔপন্যাসিক হতে চলেছ — তোমার বই নিশ্চয়ই শুনব। কিন্তু আজ তোমাকে এখানে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে।

বন্ধুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

অন্দরমহলে খবর দেওয়া হলো এই বিশিষ্ট অতিথির আগমনের।

তারপর প্রভাতী জলযোগ সমাপন করে ক্ষেত্রনাথের বৈঠকখানার ফরাশের উপর বসে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পড়তে শুরু করেন। দুই বন্ধুর মাঝে গড়গড়ার নল। ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। শ্রোতা ও পাঠক ডুবলেন তন্ময়। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়। ক্ষিদে পেলে বই রেখে দুই বন্ধুতে একত্র আহার সমাপন করলেন। আবার শুরু হয় গ্রন্থপাঠ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত হলো। বঙ্কিমচন্দ্র তখন শেষ পরিচ্ছেদের শেষ কয়টি লাইন

পড়ে শোনাচ্ছিলেন:

'আয়েষা বাতায়নে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্গুরীয় গরলাধার। একদিন মনে করিতেছিলেন, এই গরল পান করিয়া এখনই সকল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি। আবার ভাবিতেছিলেন, এই কাজের জন্য কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন? যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? জগৎসিংহ শুনিয়েই বা কি বলিবেন?

'আবার অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিতে পরিলেন। আবার কি ভাবিয়া খুলিয়া লইলেন। ভাবিলেন, এ লোভ সংবরণ করা রমণীর অসাধ্য। কুলোপান্তে দূর করা উচিত।

এই বলিয়া আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠা উল্টিয়ে এক পাশে সযত্নে রেখে দিলেন। গড়গড়ায় দীর্ঘক্ষণ টান দিয়ে পাঠের ক্লান্তি দূর করলেন। তারপর বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন: কেমন লাগল, দীনু?

— You are a genius, Bankim — বঙ্কিম, তুমি সত্যি একটি প্রতিভা। এক বিরাট প্রতিভার বীজ নিহিত রয়েছে তোমার এই নবেলের মধ্যে। এই আমার দৃঢ় ধারণা। তবে—

— তবে কি?

— বলছিলাম কি, এটা ওরাই প্রকাশ করবে না।

বাংলার ভাবী সাহিত্য-সম্রাটের মনটা যেন প্রেমের অঙ্কুরে সম্পন্ন হয়ে উঠলো মধুর এই সম্বন্ধে।

১৮৬৫।

ছাপার অক্ষরে বেরুলো দুর্গেশনন্দিনী।

সঞ্জীবচন্দ্রই উদ্যোগী হয়ে এটি প্রকাশ করেছিলেন।

ছেলেবেলায় তাঁর মেজঠাকুরদার কাছে বঙ্কিমচন্দ্র গড় মান্দারণের কাহিনী শুনেছিলেন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। বাংলায় বিষ্ণুপুরের রাজকাহিনী। বাংলার মুসলমান রাজত্বের শেষ শেষকাল — যখন গড় মান্দারণে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঐ ঠাকুরদাদার মুখে প্রথম শুনেছিলেন যে, উড়িষ্যা থেকে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের ঘর-বাড়ি লুট-পাট করে জমিদার ও তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। রাজপুত কুমার জগৎসিংহকে তাদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করা হয়। কুমার পাঠানদের হাতে বন্দী হন। পরে তিন বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র শুনে থাকবেন এই কাহিনী।

তারপর তাঁর বয়স যখন পঁচিশ বছর, তখন কিশোর বয়সে শোনা সেই কাহিনী রোমান্সের[১], এক আশ্চর্য রূপ নিল তাঁর লেখনী মুখে। সেই রূপের ছটায় সমুদ্ভাসিত হলো বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা দেশের দিগন্ত। আলোড়িত হয়ে উঠল বাঙালির মানসলোক।

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হলো।

প্রকাশিত হলো বাংলা দেশের প্রথম সার্থক রোমান্স বা রোমান্টিক

---

১ ইংরেজি সাহিত্যে, নরনারী রহস্য-মূলক আখ্যানকে বলা হয় Romance বা রোমান্স। উপন্যাস ও রোমান্স ঠিক সমগোত্রীয় নয়।

উপন্যাস। সবাই পাঠ করে মুগ্ধ হয়। অনেকে এর বিরূপ সমালোচনাও করেন। যত প্রকারেরই রচনাই হোক — দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করে শিক্ষিত বাঙালি আনন্দ পেলো। নতুন প্রেরণা পেল আর পেল মনুষ্যত্বের আদর্শের সন্ধান। সত্য কথা বলতে কি, দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন বাংলা সাহিত্যের আকাশে [illegible] আসর হলো। বাংলা কথা-সাহিত্যের একটা নতুন সম্ভাবনা দেখা দিল। দেখা দিল একটা মত-রূপ বিতর্ক। সকলেই বিস্মিত হয়। সেদিনের সেই বিস্ময়ের কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত-শিষ্য মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন:

'যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সেই আলোক-কিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া অনুভব করিল।... বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে — নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।'

এইভাবে সেদিন বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূর্য বহন করে এনেছিল দুর্গেশনন্দিনী — যেমন ঠিক এর চার বছর আগে বাংলা কাব্যে নবযুগের সূর্য বহন করে এনেছিল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য। বাংলা সাহিত্য জগতে এই দুটিই ছিল সেদিনকার দুটি বৃহত্তম ঘটনা। এইভাবেই সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা কথা সাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন প্রভাতের নব সূর্যোদয়। এরই নাম যুগ প্রতিভা।

—

সাত

দুর্গেশনন্দিনী নিয়ে হলো নিন্দা ও প্রশংসা দুইই।

ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু কলকাতার পণ্ডিতেরা কিছুতেই এর সুখ্যাতি করতে পারলেন না। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর 'সোমপ্রকাশ' কাগজে উপন্যাসটির ভাষা নিয়ে খুব বিদ্রূপ করেছিলেন। মোট কথা, সেদিন দুর্গেশনন্দিনীকে নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনার শেষ ছিল না। সেকালের দিনে যত পত্র-পত্রিকা ছিল, তার সবগুলিতেই এর সমালোচনা বেরিয়েছিল। নিন্দার চেয়ে কিন্তু, প্রশংসার ভাগই বেশি। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করল যে, বাংলা সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নতুন জিনিস দেখা দিয়েছে। যে কাগজে কিশোর বয়সে তাঁর কবিতা বেরিয়েছিল, সেই 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাও বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম উপন্যাসটির খুব প্রশংসা করেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই দুর্গেশনন্দিনী তেরো বার ছাপানো হয়েছিল এবং ইংরেজি, হিন্দী, হিন্দুস্থানী ও কানাড়ী ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বই বেরুবার আট বছর পরে নাট্যাকারে এটা পরিবর্তিত হয় ও তখনকার বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে অভিনীত হয়। এইভাবে দুর্গেশনন্দিনী সকলের চিত্ত জয় করেছিল আর এর লেখককে করেছিল যশস্বী। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর সেই যশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এক বছর পরের কথা।

১৮৬৬ সালের শেষাশেষি বেরুলো তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস— 'কপালকুণ্ডলা'। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এর ছয় বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র

যখন মেদিনীপুরের অন্তর্গত নেগুঁয়াতে (বর্তমানে নাম কাঁথি) বদলি হয়েছিলেন সেই সময়েই তিনি
এই উপন্যাস রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন কাঁথির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, কথিত
আছে, তখন এক কাপালিক প্রায়েই রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত।
কাছেই সমুদ্রতীরে দরিয়াপুরে ছিল তার সাধনার নিভৃত জায়গা। ঐ
কাপালিকের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। সেই জটাজুট, গলিত শবের উপর
রুদ্রাক্ষমালা পরিশোভিত কাপালিকের বিচিত্র কাহিনী নিয়েই তিনি লিখেছিলেন
এই উপন্যাস। এর ভাষা কবিত্বপূর্ণ, সংলাপ যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি সরস।
কেবলমাত্রই বাংলা পাঠক সমাজে খুব সমাদর লাভ করে। 'পথিক, তুমি পথ
হারাইয়াছ?' – নবকুমারের প্রতি কাপালিক-প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলার
এই বিচিত্র প্রশ্নটি পাঠকদের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

বঙ্কিমগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। তিনি
লিখেছেন: 'এই উপন্যাসখানি বাহির হওয়া মাত্র বঙ্কিমবাবুর যশোরাশি
চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল' সন্দেহ নেই। দুর্গেশনন্দিনীর তুলনায় কপাল-
কুণ্ডলার বেশি প্রশংসা হলো। তাঁর এই দ্বিতীয় উপন্যাসখানিও ইংরেজি, জার্মান,
সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষায় অনুবাদ বেরিয়েছিল। কপালকুণ্ডলার ভাষা
কি রকম কবিত্বপূর্ণ তার একটু উদাহরণ এখানে তুলে দিলাম। বনের মধ্যে পথ
হারিয়ে নবকুমার যখন কাপালিকের হাতে বন্দী হন, তখন সেইখানে
সমুদ্রের উত্তাল গর্জন শুনে নবকুমার সমুদ্রতটে এসে উন্মুক্ত সাগর দেখে কি
রকম বিস্ময় বোধ করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা এইভাবে প্রকাশ করেছেন:

'সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর যায় চক্ষু ততদূর পর্যন্ত তরঙ্গভঙ্গ-প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীল জলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল।... এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশে দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল।'

space

বঙ্কিমচন্দ্র সব শুদ্ধ চৌদ্দখানি উপন্যাস রচনা করেছেন।

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাধারাণী, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম — এই চৌদ্দখানি উপন্যাস যেন বাংলার মুকুটে চৌদ্দটি রত্ন। তাঁর এই উপন্যাসগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে — ১. ঐতিহাসিক উপন্যাস; ২. সামাজিক উপন্যাস ও ৩. দেশপ্রেমমূলক উপন্যাস। তাঁর প্রথম সকল উপন্যাসই শিক্ষিত বাঙালির চিত্ত জয় করেছিল। তখন বিলাতে স্যর ওয়ালটার স্কটের খুব নাম নভেলের। তাঁর 'আইভ্যানহো'[১] উপন্যাসটি পড়েননি শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে এমন কেউ তখন ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনখানি উপন্যাস বেরুবার পর তাঁর জনপ্রিয়তা খুবই বেড়েছিল; তবে পাঠকসমাজে তিনি যেন বাংলাসাহিত্যের স্কট বলে অভিহিত হয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে

১ Ivanhoe: Sir Walter Scott.

প্রায় সবগুলিই বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষ করে হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটি, তামিল ও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ হওয়ার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবিতকালেই ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে সম্মানলাভ করেছিলেন।

প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস লেখার পর ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর নিজস্ব পত্রিকা বের করলেন, তখন সেই পত্রিকায় মাসের পর মাস প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর প্রথম সামাজিক উপন্যাস (বিষবৃক্ষ)। এবার আর কাহিনী নয়, আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা নিয়ে লেখা উপন্যাস। বাঙালি জীবনের — পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ছবি ফুটে উঠল বিষবৃক্ষের পাতায় পাতায়। নিজের জীবনের ছবি দিয়ে শিল্পী এবার আঁকলেন তাঁর অশান্তির ঘরের ছবি, নিজের সমাজের ছবি। অপূর্ব রঙে ও রেখায় ফুটে উঠল সেই ছবি। একবার একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শুনেছি, বিষবৃক্ষে আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, এ কি সত্যি?

— অনেক সত্যি আছে। তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাতে হয়েছে। উত্তরে এই কথা বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই উপন্যাসের সূর্যমুখী একটি সুন্দর চরিত্র।

বাঙালির বীরত্ব, বাঙালির শৌর্যবীর্যের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের বড় প্রিয় ছিল। বাঙালী ভীরু, বাঙালি কাপুরুষ, বিদেশী ইতিহাসকারদের লেখা এসব কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের এই কলঙ্ক দূর করবার জন্য তিনি যেন সংকল্প করেছিলেন। বাঙালিকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই ছিল যেন তাঁর জীবনের ব্রত। তাইতো তিনি একে একে লিখলেন আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম।

একক 'আনন্দমঠ' রচনা করে তিনি যে অক্ষয়কীর্তি অর্জন করেছেন
তার তুলনা নেই। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নিষ্কাম স্বদেশপ্রেম এই
পুস্তকের মধ্য দিয়ে যেভাবে সমকালীন তরুণদের প্রাণে জাগিয়েছিল স্বদেশভক্তি।
জাগিয়েছিল আত্মত্যাগ ও দেশধর্মের ভাব। এই সন্ন্যাসী উপন্যাস আমাদের
জাতীয় জীবন নতুনভাবে গঠন করে দিয়েছে, আর কোন লেখকের উপন্যাস তা
পারেনি। এই উপন্যাসের মাধ্যমে সেই অমর সংগীত 'বন্দে মাতরম্' প্রথম
আমাদের প্রাণে শিহরণ জাগায়।

বন্দে মাতরম্ গানটি অবশ্য আনন্দমঠের অনেক আগে লেখা। এটি
লিখে তিনি ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন, কাউকে দেখাননি, বা তাঁর কাগজেও
ছাপাননি। একদিন বঙ্গদর্শনের জন্য লেখা কম পড়েছে; কাগজের হেড কম্পোজিটর
সম্পাদকের কাছে এসে বলেন, একটা কিছু লেখা দিন তো। বঙ্কিমচন্দ্র ড্রয়ার থেকে
সেই লেখাটি বের করে তার হাতে দিলেন। লেখাটি একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে,
সংস্কৃত ও বাংলা মিশিয়ে এটা কী লিখেছেন?

— যা লিখেছি, বিশ-ত্রিশ বছর পরে এর মানে লোকে বুঝবে।

পরে তিনি এই গানটি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মধ্যে বসিয়ে
দেন। তাঁর এক মেয়েকে একটি চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন: 'এখন এই
গানের মর্ম কেউ বুঝবে না। একদিন আসবে যেদিন এই গানে দেশ তোলপাড়
হবে। তখন আমি বেঁচে থাকব না।'

কী অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন বন্দেমাতরমের রচয়িতা।
এ যেন গান নয়, এ যে মন্ত্র— দিব্যমন্ত্র। এই মন্ত্র রচনা করেই বঙ্কিমচন্দ্র অমর হয়ে

'ঋষি বঙ্কিম' এই নামে মুদ্রিত হয়েছে। সারা ভারতের জাতীয় সংগীত হল
এই বন্দেমাতরম্। এই বন্দেমাতরম মন্ত্র বক্ষে নিয়েই তো আমরা স্বাধীনতার
জন্য সংগ্রাম করেছি। একটা পরাধীন জাতিকে উথাল-পাথাল করে
দিয়েছিল এই একটি মন্ত্র — এই বন্দে মা! এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে
খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্বদেশকে 'মা' বলে ডাকতে শিখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র।
পুঁথির পাতা থেকে উদ্ধার করে জনতার সামনে এই অগ্নিমন্ত্রকে প্রথম
তুলে ধরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৬ সালে। সেই সময় কলকাতার বীডন স্কোয়ারে
(এখনকার নাম 'রবীন্দ্র-কানন') জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল। সেই
অধিবেশনে স্বয়ং কবি 'বন্দেমাতরম্' গানটি গেয়েছিলেন; তিনিই এর সুর
দিয়েছিলেন। দেশী-বিদেশী অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। শ্রী অরবিন্দ
গদ্যে ও পদ্যে এই গানটি অনুবাদ করেছেন। তিনি বললেন, আমাদের দেশপ্রেমের গঙ্গোত্রী 'বন্দেমাতরম্'।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বন্দেমাতরমের যে
গৌরবময় ভূমিকা তা কোনদিনই বিস্মৃত হওয়ার নয়। আমাদের জাতীয় জীবনে
এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই মন্ত্রটি রচিত হয়েছিল ১৮৭৫ সালে। হিসাব মতে
একশো বছর পূর্ণ হলো। পরাধীন ভারতে এই মন্ত্র আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের
প্রাণে যে প্রেরণা জুগিয়েছিল, আর স্বাধীনতা লাভের পর আমরা যখন ভারত গঠনের কাজে নিযুক্ত হয়েছি
তখনো এই মন্ত্র আমাদের সমানভাবেই অনুপ্রাণিত করবে। এই মন্ত্র বক্ষে
নিয়ে একদিন আমরা যেমন সরল মেরুদণ্ড নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, আজো
তেমনি এই মন্ত্রকে আশ্রয় করে জাতি গঠনের কাজে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বন্দেমাতরম্'-এর মাহাত্ম্য এইভাবে বর্ণনা করেছেন: 'বঙ্কিমবাবু যে কার্য করিয়াছেন ইহা ভারতবর্ষের আর কেহ করে নাই। তিনি জন্মভূমিকে মা বলা, জন্মভূমিকে ভালবাসা, জন্মভূমিকে ভক্তি করা শিখাইয়াছেন। সুতরাং তিনি আমাদের গুরু, তিনি আমাদের নমস্য, তিনি আমাদের ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে মন্ত্র বন্দে মাতরম্।'

তোমরা কখনো ভুলবে না — বন্দেমাতরম্ দেশকে ভালবাসার, দেশের মানুষকে ভালবাসার মন্ত্র।

space

কোষ্ঠীবর্তী দেশের রাজনৈতিক দুরবস্থা, সাংস্কৃতিক অধঃপতন, নৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদি নানা দুর্গতির কারণ ভেবতে ভেবতে বঙ্কিমচন্দ্র খুঁজেছিলেন মানুষের জীবনের যথার্থ সার্থকতার লক্ষ্য। বাঙ্গালার মধ্যে আর ভারতের প্রতি দুই-ই তাঁর চিন্তায় স্থান পেয়েছিল সমানভাবে। তাঁর এই চিন্তারই ফসল তাঁর শেষ দুখানি উপন্যাস — দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম। আমাদের জাতীয় জীবন যেন চলছিল তাঁর যুগে দাসত্বে নিপীড়িত ও বিদেশী শাসকের অধীনতা স্বপ্নালোকে অবশ্য বাঙালির জীবনে আবার যে সুদিন আসবে, সেই আশার কথা, আশ্বাসের কথা-ই বঙ্কিমচন্দ্র প্রচার করে বলে গিয়েছেন তাঁর এই শেষ উপন্যাস দুখানির মধ্যে।

দেশকে তিনি দেশের অতীত থেকে বর্তমান কাল অবধি সুদীর্ঘ প্রেম ভালবাসায় প্রসারিত করে নিজের হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন। সনাতন হিন্দুধর্মের গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে — এই বিশ্বাস ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। সেই বিশ্বাসের ছবি আছে দেবী চৌধুরাণী আর সীতারাম উপন্যাসে। সীতারাম উপন্যাসের মধ্যে সেই প্রসিদ্ধ উক্তি — 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?' — আজো হিন্দুর প্রাণে জাগিয়ে তোলে এক দিব্য অনুভূতি।

হিন্দুর অতীত গৌরব বিশ্বাসী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সীতারাম লিখবার

অনেক বছর আগে তিনি এক সময়ে উড়িষ্যায় যাজপুরে বদলি হয়েছিলেন। সেখানে বৈতরণী নদীর কাছে উদয়গিরি-ললিতগিরি পাহাড়ে হিন্দু-ঐশ্বর্যের অপূর্ব নিদর্শন দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। সীতারাম উপন্যাসের এক জায়গায় সেই স্মৃতি এই মর্মস্পর্শী ভাষায় রূপ পেয়েছে:

'একপারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী, নীলবারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত ধান্য বা হরিৎক্ষেত্র চিত্রিত পৃথ্বী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়।... সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্তি। পাথর এমন করিয়া যে কালিম করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর-মূর্তি সকল যে খোদিয়াছিল — এই সর্বাঙ্গসুন্দর গঠন, সৌকুমার্যের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান সম্মিলনধরা স্ত্রীমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু?... তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্তি। তখন মনে করিলাম হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।'

তোমরা বড় হয়ে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পড়বে, তখন বুঝতে পারবে যে, এমন করে 'আমাদের অতীত গৌরবের কথা

আর কোন লেখক বলতে পারেন নি। বুঝতে পারবে কেন বঙ্কিমচন্দ্র জন্মভূমিকে স্বর্গের চেয়ে গরিয়সী বলে বন্দনা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র — এঁরা সকলেই ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত, তাঁর স্বদেশপ্রীতির উত্তরসাধক। এইজন্য তাঁকে বলা হয় জাতীয়তার জনক।

আনন্দমঠ,

দেবী চৌধুরানী,

সীতারাম — এই ত্রয়ীর ভেতর দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বদেশবাসীকে কত সুন্দরভাবে কর্মযোগের নিষ্ঠায় দীক্ষা দিয়ে গেছেন। দেশের জন্য, জাতির জন্য কেমন করে আত্মত্যাগী হতে হয়, কেমন করে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরার্থে বা সকলের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে হয়, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে সেই মহৎ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। এইখানেই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব।

অনেকে উপন্যাস লিখে থাকেন শুধু পাঠকদের মনোরঞ্জন করবার জন্য। বঙ্কিমচন্দ্র মনোরঞ্জনের সাথে পাঠকদের চোখে, দেশপ্রেমের যে অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছেন তা কোন দিনই মুছবার নয়। সেই অঞ্জন মেখেই তো আমরা মৃন্ময়ী জন্মভূমিকে চিন্ময়ী বলে জানতে শিখলাম। এইজন্যই তো বাঙালীর হৃদয়-সিংহাসনে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান শাশ্বত হয়ে আছে।

আট

— একখানা মাসিক পত্রিকা বের করলে কেমন হয়, অক্ষয়?

— আমিও সেই কথা আপনাকে বলব বলব ভাবছিলাম।

— তত্ত্ববোধিনীর,[1] পর আর একটিও ভাল কাগজ বের হলো না।

— তখন অক্ষয় দত্ত ছিলেন, রাজনারায়ণ বসু ছিলেন। এঁরা সবাই লিখতেন, তাই কাগজ সুন্দর কাগজ হয়েছিল।

— কেন, কেশব সেনের সুলভ সমাচার কাগজও খুব নাম করেছে।

একদিন সকালবেলায় বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে একখানি মাসিক পত্রিকা বের করা নিয়ে এই-রকম আলোচনা করছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি তখন ওখানে বদলি হয়েছেন। ঐসময় বাংলার অনেক বড়ো মানুষ ওখানে বাস করতেন। এঁরা সকলেই বিভিন্ন কর্ম উপলক্ষে ওখানে ছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র, রামদাস সেন, চন্দ্রনাথ বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একত্রে তখন ছিলেন। তাঁদের অনেকের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কাগজ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। কাগজ কে বের করলেই হবে না — লেখক চাই, সত্যিকার লেখক চাই। এমন সব লেখা তাঁর কাগজে বের হবে যা পাঠ করে বাঙালি পাঠক সবিস্ময়ে বলবে — এই তো একদিন যাতে সাহিত্যের একখানা ভাল কাগজ বেরুল।

এই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মনোগত অভিলাষ।

— কাগজের কি নাম রাখা যায়, অক্ষয়?

---

১. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী নাম দিয়ে একটি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন; অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এর সম্পাদক।

—নাম? নাম একটা দিলেই হলো।

—তুমি যে শেক্সপিয়রের মতোয় উত্তরটা দিলে — 'What is in a name?' না অক্ষয়। নামই তো সব। একটা ভাল নাম দরকার — এমন নাম যা লোকের মনের মধ্যে গেঁথে যাবে চিরকালের মতো।

—তাহলে নাম দেওয়া যাক সাহিত্য-চন্দ্রিকা বা কৌমুদী।

বঙ্কিমচন্দ্র একটু চুপ করলেন। ভৃত্য মুরলী গড়গড়ায় একটা নতুন কল্কে লাগিয়ে দিয়ে গেল। ধীরে ধীরে চোখ বুজে গড়গড়ায় টান দিতে থাকেন বঙ্কিমচন্দ্র। তন্ময় হয়ে কী যেন চিন্তা করছেন। অক্ষয়চন্দ্রের মনে হলো তিনি ধ্যানস্থ। হ্যাঁ, তিনি ধ্যানই করছিলেন — দেশমাতৃকার ধ্যানে ডুবে আছেন। কিছুক্ষণ বাদে দুই চোখ মেলে তিনি বলে উঠলেন, 'অক্ষয়', নাম একটা পেয়েছি মনের মতো। বঙ্গদর্শন।

— ব-ঙ্গ-দ-র্শ-ন। কী সুন্দর নাম।

—তোমার পছন্দ হয়?

—এ যে দিব্য নাম; যে শুনবে তারই পছন্দ হবে।

সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে কাগজ বের করা নিয়ে আর একদফা আলোচনা হলো। তখন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সকলেই একবাক্যে বঙ্গদর্শন নামটি পছন্দ করলেন। এই নামেই পত্রিকা বের করা সাব্যস্ত হলো। বঙ্কিমচন্দ্রই সম্পাদক হবেন — এটাও ঠিক হলো ঐ সান্ধ্য বৈঠকে। বঙ্গদর্শনের জন্মকাল থেকে যে দুজন সাহিত্যিক সব সময় সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও চন্দ্রনাথ বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বড় দুঃখ যে তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু দীনবন্ধু মিত্র তখন আর ইহলোকে ছিলেন না। কাগজ বের হওয়ার কুড়ি মাস আগে (১৮৭৩) তিনি অকালে মারা যান।

১২৭৯। বৈশাখ মাস।

বঙ্গদর্শন আত্মপ্রকাশ করল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে বলা যায় যে, প্রথম সংখ্যা থেকেই পত্রিকাটি শিক্ষিত বাঙালির চিত্ত জয় করল। কাগজে ভুলেও বাংলা সাহিত্য জগতে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য এবং সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, সঙ্গীত, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমালোচনা — এমন কোন বিষয় ছিল না যা বঙ্গদর্শনে লেখা হতো না। এক-একজন এক-একটি বিষয়ে লিখতেন। সকলের লেখা বঙ্কিমচন্দ্র নিজে দেখে দিতেন, দরকার হলে সংশোধিত করে দিতেন। তিনি নিজেও অনেক বিষয়ে লিখতেন। ঔপন্যাসিক হিসাবে যেমন, সম্পাদক হিসাবেও তেমনি. তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সবাইকে বিস্মিত করলেন।

বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকে বেরুতে থাকে তাঁর বিষবৃক্ষ উপন্যাস। একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করা সহজ কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই দায়িত্ব বহন করেছিলেন একাদিক্রমে চার বছর। তাঁর বড়দাদা সঞ্জীবচন্দ্র দুটো বছর এই সাহিত্যকর্মে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন। তিনি আবার [illegible] দায়িত্বটা নিলেন। আর সহকারীর মধ্যে তিনি পেলেন শ্রীশচন্দ্রকে। তিনি কনিষ্ঠের এই কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন মন-প্রাণে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন।

এই নাম দুটি এক ও অভিন্ন হয়ে আছে বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে। বঙ্গদর্শন কেবল নিছক সাহিত্য পত্রিকা ছিল না; এর উদ্দেশ্য ছিল আরো গভীর, আরো মহৎ। বাঙালিকে বাংলার মর্ম দর্শন করাবার জন্যেই তিনি বের করেছিলেন

এই পড়িনা। অথচ তার দিকে যাঁরাই শুধু ইংরেজি লেখাপড়া শিখছেন তাঁরা ভুলে যেতেন তাঁদের মাতৃভাষা। বিদেশী ইংরেজি ভাষায় তাঁরা ঘরে-বাইরে কথা বলতেন। বাঙালি হয়ে বাংলায় কথা বলবো না, বাংলা পড়বো না — এমন কথার প্রকাশ্যে এই মানসিকতা, আমরা অনুমান করতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্রকে ব্যথিত করে থাকবে। মাতৃভাষার প্রতি এই অনাদর তাঁকে নিশ্চয়ই বিচলিত করে থাকবে। দেশের শিক্ষিত লোকেরা যদি মাতৃভাষার চেয়ে উপেক্ষা ও অনাদর দেখায়, বঙ্কিমচন্দ্র ভাবলেন, তাহলে বাংলাভাষার উন্নতি হবে কি করে আর বাংলা সাহিত্যেরই বা উন্নতি হবে কি করে?

তাঁর এই প্রখর চিন্তাভাবনার ফল-ই 'বঙ্গদর্শন'।

নবীন ও প্রবীণ লেখকদের নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তৈরি করলেন বঙ্গদর্শনের নিজস্ব লেখক-গোষ্ঠী। সেদিন তাঁকে কেন্দ্র করে এই যে একটি সাহিত্য-চক্র গড়ে উঠেছিল তা সত্যিই দেখবার মতো ছিল। নীলাকাশে নক্ষত্ররাজির মধ্যে চাঁদ যেমন শোভা পায়, তেমনি এইসব লেখকদের মধ্যে শোভা পেতেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁদের মধ্যেই তিনি তখন বাংলার সাহিত্যাকাশের উপর স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখ্যাছেন

যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই কাগজটি বের করেছিলেন, সেই কথা বলতে গিয়ে বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন:

'বাঙ্গালি কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালি অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালি হঠাৎ ইংরাজ হইতে পারিত, তবে ত মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; পাঁচ-সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না।

বলেন কি: 'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল'

দিনদিন দ্বিগুণ হইতে থাকিবে বৃদ্ধি পাইল। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। সমস্ত বাঙ্গালির উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরেজি বুঝে না, কস্মিনকালে বুঝিবে এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না।'

সমাজচিত্তে স্বদেশের কথা মাতৃভাষায় শোনাবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বের করেছিলেন 'বঙ্গদর্শন'। শিক্ষিত ও জনসাধারণের মধ্যে যাতে সহৃদয়তা বৃদ্ধি পায় সেইজন্যই সেদিন প্রয়োজন হয়েছিল এমনি একখানা কাগজের আর দরকার ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সব্যসাচী লেখকের। পত্রিকা চালাবার জন্য তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হতো। সরকারি চাকরির চাপ তো ছিলই, তার উপর তাঁর কাঁধে চাপল এই নতুন বোঝা। যেদিন কাগজ বেরুল সেদিন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি নিজের মাথায় বহন করেছেন এই গুরুতর দায়িত্ব। এই পত্রিকা সম্পাদন করতে গিয়ে কত রাত তাঁকে না ঘুমিয়ে কাটাতে হয়েছে। মাসের পর পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করতে কত রকমের লেখা তাঁকে লিখতে হয়েছিল,— সেসব কথা আজ যখন আমরা স্মরণ করি তখন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের শির নত না হয়ে পারে না। বীণাপাণি স্বয়ং যেন তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন সোনার কলম। যা লিখতেন, তা সোনার কাঠির স্পর্শে যেন সোনা হয়ে, চিরন্তন হয়ে উঠত। বাঙালির হৃদয় ভরে উঠেছিল সেইসব বিচিত্র রচনা পাঠ করে।

বাঙালী তার মাতৃভাষার আদর করবেনা, বঙ্কিমচন্দ্র এটা যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না। তিনি নিজে ছিলেন ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষিত, এবং প্রথম প্রথম তিনি ইংরেজিতেই আরম্ভ করেছিলেন সাহিত্য কর্ম। কিন্তু তাঁর সেই ভুল ভাঙতে খুব বেশি দেরী হয়নি, একথা আগেই বলা হয়েছে। তিনখানা উপন্যাস লেখার পর তিনি আরম্ভ করেন "বঙ্গদর্শন"। দেখতে দেখতে নবজাত পত্রিকাটি বাংলার জীবন ও সংস্কৃতির দর্পণস্বরূপ হয়ে উঠল। বাঙালির শিক্ষিত সমাজ নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে নতুন পথে এগিয়ে চললো।

বঙ্কিমচন্দ্রের চার-পাঁচখানা উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায়। তাঁর উপন্যাসই ছিল পত্রিকাটির প্রধান আকর্ষণ। এছাড়া নতুন ধরনের ব্যঙ্গাত্মক রচনাও প্রকাশিত হতে থাকে। বিজ্ঞান বিষয়েও কিছু কিছু রচনা তিনি লিখতেন। এই জাতীয় রচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো 'কমলাকান্ত'; ব্যঙ্গের ছলে তিনি স্বদেশপ্রেম বা দেশভক্তির কথা যেভাবে কমলাকান্ত চক্রবর্তীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন তা এক কথায় অতুলনীয়। বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় কমলাকান্তের দেখা আমরা পাইনি।

বঙ্কিম-কল্পনার এক অদ্ভুত সৃষ্টি এই কমলাকান্ত। তোমরা বড় হয়ে যখন এই বইখানি পড়বে তখন বুঝতে পারবে যে, এই আফিমখোর, আধপাগলা মানুষটির মধ্যে কী অসাধারণ এক জ্ঞানী মানুষ আত্মগোপন করে রয়েছেন। বুঝতে পারবে সেই মানুষ কেমন সুনিপুণভাবে সমাজের সব দীনতা আর ভণ্ডামির ওপর চাবুক মেরেছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর' বঙ্গদর্শনের

দ্বিতীয় আবরণ হয়ে উঠেছিল। যে সংখ্যাটিতে সর্বপ্রথম এই রচনাটি এবং আফিমখোরের মজুরীটি বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থাপিত করলেন বঙ্গদর্শনের পাঠকদের জন্যে, সেই রচনাটি পাঠ করে চন্দ্রনাথ বসু বঙ্গদর্শন সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আপনিই কি কমলাকান্ত চক্রবর্তী?

– তোমার কি মনে হয়; চন্দ্রনাথ।

– আমার তো তাই মনে হয়।

– অক্ষয় কিন্তু তা বলে না। সে বলে কি জানো — এই চরিত্র নাকি আমার উল্টো চরিত্র। আকৃতি। বাস্তব সংসারে এমন বিচিত্র লোকের সাক্ষাৎ দেখা পাওয়া যায় না।

তাঁদের দুজনের মধ্যে যখন এই রকম আলোচনা হচ্ছিল তখন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। টেবিলের একদিকে বসে আছেন বঙ্গদর্শন-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র আর উল্টো দিকে পাশাপাশি বসেছেন চন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র। দুজনেই সুলেখক। দুজনেই বঙ্কিমের সুযোগ্য শিষ্য। অক্ষয়ের কথার রেশ টেনে চন্দ্রনাথ বললেন, আচ্ছা অক্ষয়বাবু, কমলাকান্ত কে বলতে পারেন?

– বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের কল্পনা। এমন মানুষ ভূ-ভারতে নেই, হতে পারে না।

– শোনো অক্ষয়। তুমি হয়ত বোঝ নাই এর, লেখাটির চরিত্র-সৃষ্টির সার্থকতা কোথায়। কালে কালে প্রমাণ পাবে। এখন হয়ত অনেকে এর মর্মগ্রহণ করতে পারবেনা।

– মাত্র কালে কালে কমলাকান্তের মর্ম

গ্রহণ করতে পেরেছে বাঙালি। সমস্ত পাঠকের কাছে কমলাকান্ত আর তার উক্তি কি অসাধারণ বলে মনে হয় না। বরং যদি এখন বঙ্কিম প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান হিসাবে স্বীকৃত হয়। এই আফিমখোরের উক্তি নেশার ঝোঁকে কখনো ব্যঙ্গ করেছে, কখনো চোখের জল ফেলেছে, কখনো কি নিজের মধ্যেই তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। এর দুঃখ আর বিষাদের ভেতর দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের চরিত্র আর সমাজের চরিত্র যেভাবে উদ্ঘাটন করেছেন, বাংলা সাহিত্যে এর তুলনা নেই।

কমলাকান্ত তাই এক এবং অদ্বিতীয়।
গদ্যে লেখা বাঙালি জীবনের কাব্য।

কমলাকান্ত চক্রবর্তীর ছদ্মনামে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র রাজনীতি, সমাজনীতি ও লোকচরিত্রের সমালোচনা করেছেন। পাছে শত্রুবৃদ্ধি হয়, এজন্য তিনি এই নামের অন্তরালে আত্মগোপন করেছিলেন। ব্যঙ্গ ও কৌতুকে, রঙ্গ ও রসিকতায় উজ্জ্বল এই রচনাটি যেমন উপভোগ্য, তেমনি মর্মস্পর্শী। এই কমলাকান্তের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার যে ছবি ফুটিয়েছেন তা আজো আমাদের মনে প্রেরণা যোগায়. আর আমাদের অন্তরকে করে উদ্বুদ্ধ। সেই উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি আজো যেন আমরা শুনতে পাই: 'চিনিলাম, এই আমার জন্মভূমি — এই মৃন্ময়ী, মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা — এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু-বিমর্দিত বীরজন কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, কাল দেখিব না, কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না — কিন্তু কালস্রোতে একদিন দেখিব স্বর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।'

—

নয়

১৮৯০।

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে আর দশ বছর বাকী।

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন তিপ্পান্ন বছর। বত্রিশ বছর চাকরি করছেন। আর চাকরি করতে তাঁর মন চাইছিল না। তাই এইবার তিনি পেনসনের জন্য দরখাস্ত করলেন। দরখাস্ত অগ্রাহ্য হলো। সরকারী নিয়মানুযায়ী পঞ্চান্ন বছরের আগে অবসর নেওয়ার নিয়ম নেই। কিন্তু অবসর নেওয়া তখন তাঁর একান্ত দরকার।

ইলিয়ট সাহেব তখন ছোটলাট। দরখাস্ত অগ্রাহ্য হলে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে খুব শ্রদ্ধা করতেন— শ্রদ্ধা করতেন তাঁর মনীষার জন্য, সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য। লাট-পত্নীকে তিনি 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কিছু কিছু ইংরেজিতে অনুবাদ করে স্বহস্তে উপহার দিয়েছিলেন। সব কথা শোনার পর লাট সাহেব তাঁকে বললেন, আর তো দু'বছর পরে এমনিতেই পেনসন পাবেন। তবে এত তাড়াতাড়ি কিসের জন্য অবসর নেবেন?

— ইওর এক্সেলেন্সি, চাকরিতে আমার আর মন নেই। শরীরও ভালো নয়।

— কেন, আপনি তো 'দেখতে বেশ সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ রয়েছেন।

— বাইরে থেকে তাই মনে হয়। কিন্তু শরীর আমার জীর্ণ হয়ে গেছে। আমি বহুমূত্র রোগে ভুগছি।

— Very well, Mr. Chatterjee. I accept your premature retirement. (উত্তম কথা, মি: চ্যাটার্জি। আমি আপনার অবসর গ্রহণের অনুরোধ মঞ্জুর করলাম।)

বত্রিশ বছর চাকরি করবার পর ১৮৯২, ১৪ সেপ্টেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র সরকারি কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। আসল কথা, চাকরি করতে তাঁর আর মন লাগছিল না — দাসত্বের এই সোনার শেকলের ভার তাঁর কাছে যেন অসহ্য মনে হলো। তাই তিনি কিছু আগেই অবসর নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু অবসর নেবার কারণ আরো একটা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কেবলই মনে হতো তিনি যেন তাঁর যোগ্যতার উপযুক্ত স্বীকৃতি পান নি। তাঁকে কমিশনার র‍্যাঙ্কে প্রোমোট করার কথা উঠেছিল, কিন্তু ইংরেজ সিভিলিয়নদের প্রবল আপত্তির ফলেই সেটা হতে পারেনি। তিনি মনে করতেন তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে। স্বাধীনচেতা বঙ্কিমচন্দ্র এই চাকরির ■ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যে প্রথম শ্রেণীর ডেপুটির পদে উন্নীত হয়েছিলেন প্রায় তাঁর চাকরিজীবনের শেষের দিকে। কর্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়বিচারক হাকিম বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সরকারি কর্মে কোনদিন শৈথিল্য দেখান নি। তবে তিনি একটু বেশি রকমের স্বাধীনচেতা ছিলেন — উপরওয়ালার হুমকি বা তাচ্ছিল্য আর চাকরির নিয়মকানুন তাঁর কাছে সময় সময় অসহ্য মনে হতো। এইসব নানা দিক ভেবেই তিনি তিপ্পান্ন বছর বয়সে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন: 'চাকরি আমার জীবনের অভিশাপ। চাকরিই

আমার জীবনের একটি বড় বিড়ম্বনা। চাকরিই আমার আত্মনাশের কারণ। চাকরিতে অনুচিত মান হয়।" আনন্দমঠ নিয়ে তাঁকে একবার খুব বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছিল। চাকরি নিয়ে তখন টানাটানি পর্যন্ত হয়েছিল। সেই ঘটনাটি এখানে বলব।

১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয় আনন্দমঠ। বঙ্কিমচন্দ্র তখন আলিপুরের হাকিম। থাকেন কলকাতায় ভবানী দত্ত লেনের একটা বাসা বাড়িতে। বই বেরুবামাত্র সরকার থেকে একখানি গোপনীয় পত্রে লেখককে জানানো হলো যে তিনি নাকি এই বই মারফৎ 'সিডিশন' বা রাজদ্রোহ প্রচার করেছেন; অবিলম্বে তিনি যেন এর একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেন। চিঠি পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তো অবাক। কি করা যায় এখন? পত্রটিতেই বলা হয়েছিল যে যদি 'ইন্ডিয়ান মিরার' কাগজে বইটির সম্বন্ধে সমালোচনা লেখে তাহলে সরকার তা গ্রাহ্য করবেন এবং কোন কৈফিয়ৎ না দিলেও চলবে।

'ইন্ডিয়ান মিরার' (Indian Mirror) কাগজটি ছিল কেশবচন্দ্র সেনের। যেমন প্রচার তেমনি প্রতিপত্তি ওর। পত্রিকাটির সম্পাদক তখন কৃষ্ণবিহারী সেন; কেশবচন্দ্রের ছোট ভাই। বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেরই পরিচিত। কেশবচন্দ্র তো তাঁর বন্ধু ছিলেন। ভবানী দত্ত লেনের কাছেই কলুটোলা। সেইখানে দেওয়ান রামকমল সেনের বাড়ি। কেশব ছিলেন তাঁরই পৌত্র। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বঙ্কিমচন্দ্র এলেন কলুটোলায় সেনেদের বাড়ি। সঙ্গে নিয়ে এলেন একখানা আনন্দমঠ আর সেই সরকারি চিঠি। তাঁকে দেখেই সাদর অভ্যর্থনা জানালেন কৃষ্ণবিহারী; জিজ্ঞাসা করলেন — কি খবর বঙ্কিমবাবু? এমন অসময়ে?

—অসময় নয়, বরং বলতে পারো দুঃসময়।

—দুঃসময়? সে কিরকম, বঙ্কিমবাবু?

—হ্যাঁ, দুঃসময় বৈকি। সাহেবরা বড় চটেছে। এই চিঠিখানা পড়ো, তাহলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। কেশববাবু কোথায়? তাঁকেই দরকার।

—দাদা সমাজে গেছেন। কিছুক্ষণ পরেই ফিরবেন। তাড়াতাড়ি নেই তো?

—না, আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

কৃষ্ণবিহারী চিঠিখানা পড়লেন এবং তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি করতে হবে?

—ইন্ডিয়ান মিরারে একটা সমালোচনা লিখতে হবে।

—আনন্দমঠ বোধ হয় আমাদের পড়তে পারিনি।

—বই এখনও আমি সঙ্গে করেই এনেছি।

তাঁদের দুজনের মধ্যে এই রকম কথাবার্তা চলছে এমন সময় বাইরে ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। সমাজ থেকে প্রার্থনা শেষ করে ফিরলেন কেশবচন্দ্র। সহাস্য মুখে বন্ধুর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। কৃষ্ণবিহারী তখন আনুপূর্বিক সব কথা খুলে বললেন। সেই রাত্রেই তাঁরা দুজনে মিলে পড়লেন আনন্দমঠ। তারপর কৃষ্ণবিহারী লিখলেন এক একটি দীর্ঘ সমালোচনা। যথাসময়ে সেটি 'মিরারে' প্রকাশিত হলো। বলা বাহুল্য, এই সমালোচনার ফল ভালই হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বিপদ কেটে গিয়েছিল।

---

১ কেশবচন্দ্র সেন বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা ছিলেন। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

#৪/৯৬৫৫#

চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র খুব বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। মাত্র দু'বছর ছ'মাস চব্বিশ দিন। অবসর নেওয়ার পাঁচবছর আগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের কাছাকাছি প্রতাপ চাটুয্যের গলিতে একটি বাড়ি কিনে সেইখানেই বাস করতে থাকেন। এই বাড়ি তখন শিক্ষিত বাঙালীর কাছে একটি পুণ্যতীর্থ হয়ে উঠেছিল — এখান থেকেই সাহিত্য-সম্রাট রূপে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যজগতের ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন। তৎকালীন সাহিত্যসেবী মাত্রেই এইখানে নিয়মিত আসতেন। এখান থেকেই প্রকাশিত হলো তাঁর দ্বিতীয় পত্রিকা 'প্রচার'।

বহরমপুরে, কাঁটালপাড়া, হুগলী — তিনি যতকাল যেখানেই ছিলেন, সেখানেই তাঁর বাড়িতে সাহিত্যিকজনের ভিড় হতো ও সাহিত্যালোচনায় রত থাকতেন। এখন, কলকাতার বাসভবন সাহিত্যিকদের আসা-যাওয়ায় সরগরম হয়ে উঠলো। বঙ্কিম-গৃহ তখন সাহিত্যিকদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হলো। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরেশ সমাজপতি[১], পর্যন্ত কত তরুণ ও উদীয়মান সাহিত্যসেবী এসে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। তাঁর উপদেশ তরুণদের প্রাণে নব নব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করত।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চাকরিতে থাকতেই ১৮৮৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হয়েছিলেন। অবসর গ্রহণ করেও তিনি সাহিত্যসেবা থেকে বিরত থাকেননি। তাঁর সমস্ত জীবনটাই ছিল

---

১. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ছিলেন বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র ছিলেন; ইনি 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। এটি তখন একটি বিখ্যাত পত্রিকা ছিল।

বীণাপাণির সেবায় উৎসর্গীকৃত। শেষের বয়েস থেকে তিনি দেশের সমাজহিতের (দেশবাসীদের নৈতিক শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে) বিবিধ উদ্যোগের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। ১৮৭৮ সালে যখন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির চেষ্টায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট[১] স্থাপিত হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র এর একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন; এর সাহিত্য বিভাগের তিনি ছিলেন সভাপতি। এখানে তিনি বেদ সম্বন্ধে দুটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

তাঁর শেষ জীবনের বিখ্যাত রচনা হলো 'কৃষ্ণচরিত্র' আর 'ধর্মতত্ত্ব'। ঔপন্যাসিক এবার লোকশিক্ষক ও দার্শনিক রূপে আবির্ভূত হলেন। বঙ্কিম-মনীষার উজ্জ্বল নিদর্শন এই বই দুখানি। বঙ্কিমচন্দ্রের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা, অধ্যয়ন, অনুসন্ধিৎসা আর অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে এই দুখানি গ্রন্থে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে তিনি আদর্শ পুরুষ বলে স্বীকার করেছেন এবং এই কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সকল গুণ তিনি লক্ষ্য করেছেন। শেষ জীবনে লেখা হলেও, এই বইটির বিষয়-বস্তু নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় বারো- তেরো বছর অনুশীলন করেছিলেন। তাঁকে পড়তে হয়েছিল বেদব্যাসের মূল মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং, আরো অনেক পুরাণ গ্রন্থ। তাই বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, 'কৃষ্ণচরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকীর্তি।'

অবশেষে বঙ্কিম লিখলেন 'ধর্মতত্ত্ব'।

এ বই তাঁর সারা জীবনের ধ্যান ও চিন্তার ফল।

তাঁর দার্শনিক চিন্তার উজ্জ্বল নিদর্শন এই বই।

---

১ এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি যখন স্থাপিত হয় তখন এর নাম ছিল: 'Society for higher training of young men'; পরে এই নাম বদলিয়ে রাখা হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট। বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে এর একটি গৌরবময় ভূমিকা আছে।

মনুষ্যত্বকেই বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের ধর্ম বলে বিশ্বাস করতেন। এই বইতে তিনি সেই ধর্মের একটা সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর স্বজাতিকে তিনি উপহার দিলেন একটি নতুন আদর্শ ও মন্ত্র। সেই আদর্শ কি?

'দৈহিক ও মানসিক সকল রকম বৃত্তির পরিণতি সাধনই মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব সাধনই মানুষের একমাত্র ধর্ম এবং সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।'

এ সংসারে আমরা কি চাই?

সুখ। সংসারে সবাই সুখ খোঁজে, সকল মানুষই সুখের কামনা করে। তারপরেই আচার্য বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করেছেন: সুখ কি?

সুখ প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি। মনুষ্যত্বের বিকাশই প্রকৃত সুখ।

মনুষ্যত্ব কি?

'যাহা দ্বারা মানুষের প্রবৃত্তি সম্যক অনুশীলন হয় তাহাই সুখ — শরীর ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশই মনুষ্যত্ব। ইহাই মানুষের সুখ এবং ইহাই তাহার ধর্ম। ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্যত্ব, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ — সকল লইয়া ধর্ম।'

কী সুন্দর কথা। 'ধর্মতত্ত্ব'[১] তাই বাঙালির নতুন গীতা। তাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ধর্মের মূলে আছে সর্বলোকে প্রীতি। তাঁর মতে যা পরে

১ ধর্মতত্ত্ব : বঙ্কিমচন্দ্র।

হিন্দুধর্মের আদর্শ সুযোগসন্ধানী করে এমন সরল ভাবে আর কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেননি। যিনি আগে ছিলেন ঘোর নাস্তিক, এক সময়ে যাঁর চিন্তায় দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের ছিল খুব প্রভাব, সেই বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে একেবারে বদলে গিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাসের অভাব দেখে অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে তাঁর অবলম্বন হয়েছিল গীতা।

একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। কোন অসুখে বঙ্কিমকে একদিন দেখতে এসেছেন প্রখ্যাত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার। এসে দেখেন শিশির ওষুধ শিশিতেই ভরা আছে, রোগী তার এক ফোঁটাও খান নি। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন: এ কী, ওষুধ খান নি? রোগ সারবে কি করে।

— এই ওষুধেই এখন বেঁচে আছি, এবলে বুকের ওপর ডান হাত দিয়ে বড় গীতাখানা দেখিয়ে দিলেন।

চিকিৎসক আর কিছু বললেন না; শুধু রোগীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সে-মুখে তখন এক আশ্চর্য দীপ্তি ফুটে উঠেছে। ঈশ্বরবিশ্বাসের দীপ্তি।

গীতার একটি ব্যাখ্যা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়ে. কিন্তু শেষ করতে পারেননি, তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর এই ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থের মূল বক্তব্য: যা ধর্মানুমোদিত তাই-ই সত্য আর যা ধর্মবিরুদ্ধ, তা অসত্য। যাতে লোকের হিত, তাই-ই সত্য আর যা ধর্মবিরুদ্ধ; তা অসত্য। যাতে লোকের হিত, তাই-ই সত্য। এইরূপ মত সকল সময় সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন।

#space#

বঙ্কিমচন্দ্র অল্প বয়স থেকেই তাঁর শেষ জীবনের কর্মহীন করতে চেয়েছিলেন। তখন সাহিত্যে ও সমাজে তাঁর অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা। তখন চলেছে বঙ্কিম-যুগ। বাঙালীর মন, বুদ্ধি ও সাহিত্য—সবই হয়ে উঠেছে বঙ্কিমময়। যে বছর তিনি চাকরি থেকে অবসর নিলেন, সেই বছর তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। এই সরকারী খেতাব কিন্তু তাঁর রাজকার্যের পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছিল তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য। কিন্তু তাঁর অনুরাগীরা এতে খুশি হলেন না; —এতবড় প্রতিভা, তাঁকে কিনা দেওয়া হলো মাত্র 'রায় বাহাদুর'—সম্মান। এইরকম মত ব্যক্ত করেছিলেন। সরকারী উপাধির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কিন্তু কোন আগ্রহ ছিল না; এই নূতন উপাধি লাভের পর তিনি কিছুমাত্র আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন নি।

—তুমি এখন রায়বাহাদুর হয়েছ, এখন তোমার দাম কে?

—আমার খরচ বাড়লো? বঙ্কিম চাটুয্যে বঙ্কিম চাটুয্যেই থাকবে, কোনদিন সে নিজেকে রায়বাহাদুর বঙ্কিম চাটুয্যে বলে জাহির করবে না।

স্বামীর এই খুশি দেখে তবে রাজলক্ষ্মী দেবী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তখন বুঝলেন ওঁর স্বামীর মহত্ত্ব কোথায়।

১৮৯৪। নভেম্বর।

সাহিত্য-সম্রাটের জীবনের শেষ বছরটি হলো।

নববর্ষের উপাধি-তালিকায় যেন ঐ সময় তাঁকে C.I.E.[১] উপাধি

---

১. ব্রিটিশ শাসনের সম্মান উপাধি C.I.E. অর্থাৎ Companion of the Indian Empire.

দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাসাগরকেও এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল। সেদিন সকলে এসেছেন তাঁকে অভিনন্দিত করবার জন্য। টেবিলের একধারে চেয়ারের ওপর বসে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বসে আছেন নিরুত্তর স্তব্ধ, প্রশস্ত ললাটে যেন দুটি অদৃশ্য রাজটিকা আঁকানো। গৌরকান্তি, প্রশান্ত মূর্তি। সভাসদদের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বললেন, ইংরাজ আগে রায়বাহাদুর করেছিলেন, এবার C.I.E. — এটা বড়ো উপাধি হইলো আপনার যোগ্য।

— সরকার এবার সত্যিই আপনাকে সম্মান দেখালেন, বললেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

— এ সম্মানলাভের জন্য কিছুমাত্র গৌরব বোধ করি না। তোমরা আমাকে ভালবাস, এটেই আমার জীবনের সম্মান — ওদের দেওয়া উপাধি আমার কাছে কিছু নয়। এই আমার প্রাণের কথা। আমি মান চাই নিজের কাছে।

— কিন্তু আমি বলব, এ উপাধির যথেষ্ট আপনার যোগ্য নয়। আপনাকে 'নাইটহুড' (Sir উপাধি) দিলেও খুব বেশি হোত না। বললেন নবীনচন্দ্র রক্ষিত।

তখন বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, তাহলে তো সকলের আগে মাইকেলকে লর্ড উপাধি দেওয়া উচিত ছিল। ওরা কিছু করল না বলেই তো মেঘনাদে আমি লিখেছিলাম — পরকে উপাধি দাও, আপনাকে করো দেখ শ্রীমধুসূদন।

উপস্থিত সকলে বঙ্কিমচন্দ্রের এই সহজ তেজ দেখে অবাক হলেন। সম্রাটের উপেক্ষাই ছিল তাঁর সহজ।